গণবিজ্ঞান ভাবনার পত্রিকা

বিজ্ঞান অন্বেষক

বর্ষ-১৫ সংখ্যা-৬ নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৮ WBBEN/2003/11192 মূল্য : ৫ টাকা

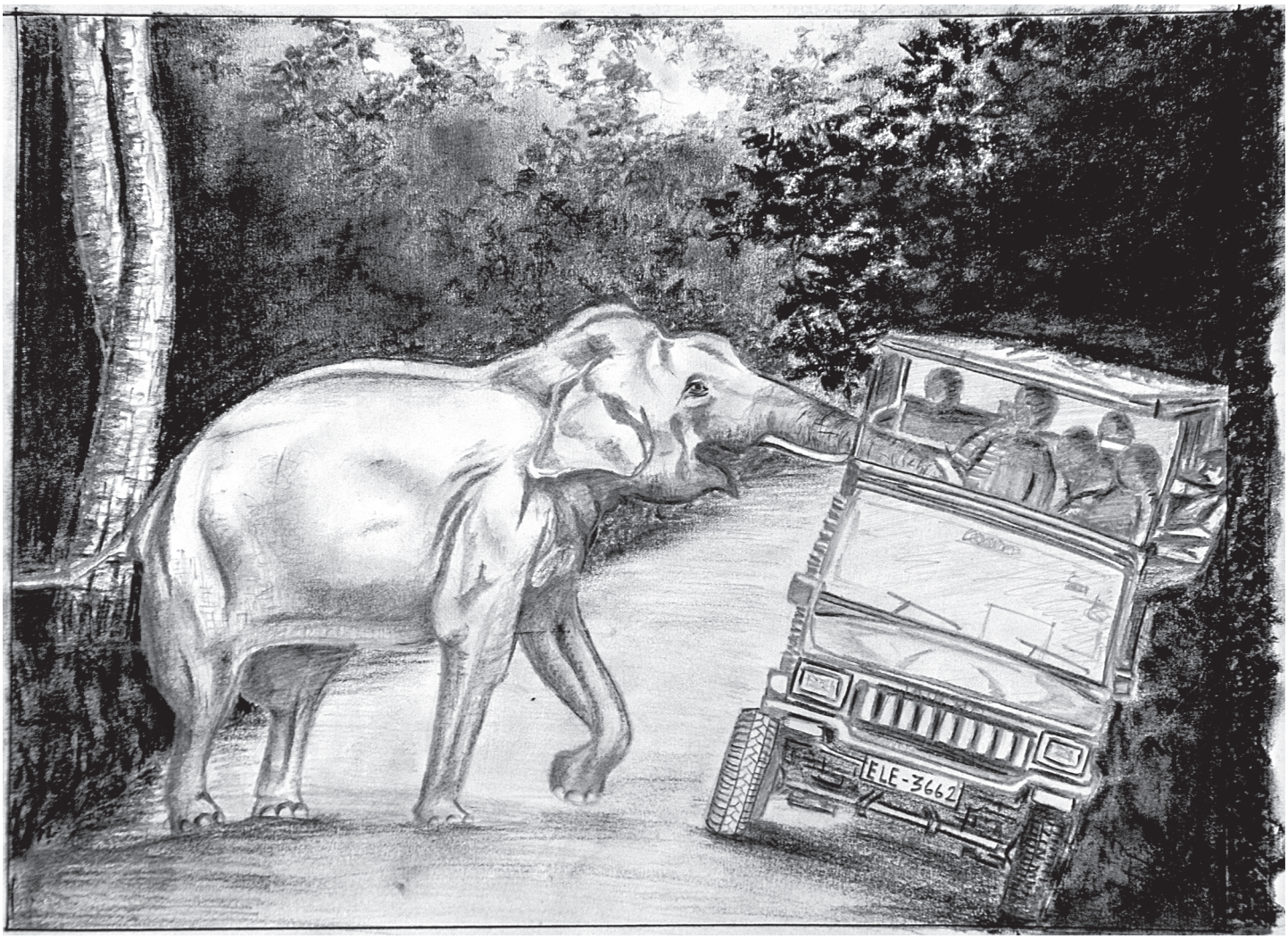

অঙ্কন : সম্রাট সরকার

❑ প্রচ্ছদ কথা ২ ❑ হাতে কলমে বিজ্ঞান ৫ ❑ মহিলা বিজ্ঞানী ৬
❑ অঙ্ক ৮ ❑ প্রাত্যহিক জীবনে বিজ্ঞান ৯ ❑ নতুন গবেষণা ১০
❑ অদৃশ্য শক্তির রহস্য ১১ ❑ কুসংস্কার ১২ ❑ সংবাদ ১২ ❑ পরিবেশ ১৩
❑ মহাকাশ ১৪ ❑ জানো কি? / কবিতা / কার্টুন ১৬

আমাদের কথা : শোক

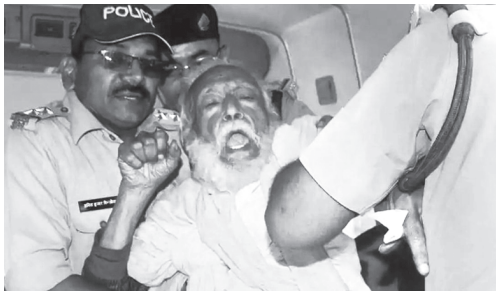

অনশনরত জি ডি আগরওয়ালকে পুলিশ হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে

মানুষ। পৃথিবীর ক্রন্দন শুনিতে কি পাও? পৃথিবী কাঁদছে। চিৎকার করে বলছে— 'মানুষ। আমার তৈরি প্রকৃতি ও জীবদের তুমি ধ্বংস কোরো না।' শুনতে পাচ্ছো? যশোর রোড, লাটাগুড়ির গাছেরা বাঁচতে চাইছে। পৃথিবী জুড়ে এরকম কোটি কোটি গাছেরা বাঁচতে চাইছে। অরণ্য বাঁচতে চাইছে। জলাশয় বাঁচতে চাইছে। জলাশয়ের জীবেরা বাঁচতে চাইছে। এই আর্তিতে ভাবাদিঘিসহ আরও কত লক্ষ জলাশয় সামিল কে বলতে পারে? মানুষ। তোমরা ও সকল জীবেরা একই পৃথিবীর প্রকৃতি মায়ের সন্তান। তবু কেন এই বৈরিতা? কেন নৃশংসতা? পৃথিবী কী শুধু তোমার জন্য? তোমাকে ছাড়া অন্য কোন জীবেরা এখানে বাঁচতে পারবে না? তুমি বলছো— 'উন্নয়ন'। 'উন্নয়ন' কাদের জন্য? সকল জীবের মৃত্যুমিছিলের বিনিময়ে 'উন্নয়ন'? সীমাহীন অনন্ত 'উন্নয়ন'-এর শেষে পৃথিবীতে শুধু মানুষ প্রজাতি থাকবে? একা মানুষ পৃথিবীতে বাঁচবে কি করে? বাস্তুতন্ত্রের কি হবে? বৃষ্টির কি হবে? প্রাণদায়ি অক্সিজেন সরবরাহ কিভাবে হবে? প্রতি মুহূর্তের বাঁচার জন্য শক্তি খাদ্যের যোগান কোথা থেকে হবে? একেবারে শেষের সেই দিনে— মানুষ তুমি নিজে কি করে বাঁচবে?

তুমি বলছো— 'না না। জীব হত্যা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছি।' শুধু চেষ্টা? কাজ হচ্ছে কি? না, হচ্ছে না। তোমাদেরই সংগঠন 'ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ডলাইফ ফান্ড ফর নেচার' এর তরফে ৫৯ জন প্রাণীবিজ্ঞানী পৃথিবী জুড়ে সমীক্ষা চালিয়ে দেখলেন ১৯৭০ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে বিলুপ্ত হয়েছে ৬০ শতাংশ মেরুদন্ডী প্রাণী। কোটি কোটি বছরে ধীর অথচ সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে অসংখ্য জীবের প্রজাতির উৎপত্তি হয়েছে। তুলনায় নবীন মানুষ, মাত্র ৫০ বছরে এই পরিণতি করলে? তাই বাধ্য হয়েই, সমীক্ষক দলের প্রধান মাইক ব্যারেট বলছেন,— 'মানব সভ্যতা কীভাবে প্রাণীকুলকে ধ্বংস করেছে, তার প্রমাণ লিপিবদ্ধ করেছেন আমাদের গবেষকরা।' বলছেন— 'আমরা ঘুমোতে ঘুমোতে খাদের কিনারায় হাঁটছি।' মনে হচ্ছে এ ঘুম আর ভাঙবে না। খাদে পতন ও মৃত্যু সুনিশ্চিত।

সমীক্ষা শুধু বিদেশে নয়। এদেশেও হচ্ছে। প্রাণদায়ি গঙ্গার কথাই ধরা যাক। মা বলে যাকে মান্যতা দাও। কারণ তাকে কেন্দ্র করেই অসংখ্য জীব ও মানুষের জীবনস্পন্দন আবর্তিত হচ্ছে। তার কি অবস্থা? নদীর উপর বাঁধ, জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, সেচের জন্য ক্যানেল কাটা, শিল্প দূষণ ও অন্যান্য বর্জ্য নিক্ষেপ ইত্যাদি বহু অত্যাচারে নদী তার স্বাভাবিক অবস্থান খুইয়ে এখন মৃতপ্রায়। কিন্তু মানুষ ঘুমিয়ে। তাই গঙ্গা নদীকে বাঁচাতে ৮৬ বছরের এক বৃদ্ধের (জি ডি আগরওয়াল) আমরণ অনশন ১১২ দিন পর মরণের মধ্য দিয়ে শেষ হল। আমরা গ্রাহ্য করলাম না। এমনকি প্রধানমন্ত্রীও তাঁর আর্ত চিঠির উত্তর দিলেন না।

মানুষ একটু থামুন। আসুন-সেই বৃদ্ধ ও সকল জীব, যাদের আমরা হত্যা করেছি, তাঁদের উদ্দেশ্যে এক মিনিট নীরবতা পালন করি।

—তাপস মজুমদার

রামজীবন ভৌমিক

প্রচ্ছদ কথা : পথের অধিকার, বণ্যপ্রাণ ও প্রগতি

''হাতিকে স্যালুট করতে গিয়ে সিদ্দিকুল্লা রহমানের মৃত্যু''—দৈনিক সংবাদ পত্রে এই সংবাদ পড়লাম গত শুক্রবার (২৪/১১/২০১৭)। অন্তর্জালে তার টাটকা দৃশ্য। পড়ে দেখে মন বিষণ্ণ হয়ে এল। হাতি তার পূর্বপুরুষের চলাচলের পথ ফিরে পেতে মাঝে মাঝে অবরোধ, ধর্না দিয়ে বসে বিভিন্ন জাতীয় সড়কে, রেল লাইনে অথবা ফসলের ক্ষেতে। গরুমারা জাতীয় উদ্যান ফুঁড়ে বইয়ে দেওয়া ৩১ নং জাতীয় সড়কে মহাকাল ধামের কাছে এক বৃহৎ দাঁতাল বৃহস্পতিবার (২৩/১১/২০১৭) বিকেল তিনটে থেকে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে দাঁড়িয়েছিল। তার দুপাশে ট্রাফিকের সারি সারি অবস্থান। এমনই এক সমাপতনে সাদিক রহমান বা সিদ্দিকুল্লা রহমানের মৃত্যু। সন্ধ্যা বা তার পর হাতির ভয়ে অতি দ্রুত জঙ্গলের জাতীয় সড়ক পার করতে গিয়ে মাঝে মাঝে যানবাহন দুর্ঘটনায় পরে। মানুষের মৃত্যুর ঘটনা এই জাতীয় সড়কে লেগেই আছে। স্থানীয় বনবাসী মানুষ হাতিকে মহাকালবাবা সম্বোধনে স্মরণ করে। হ্যাঁ, প্রতি সম্বোধনে ডানহাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার সহ। প্রকৃতি থেকে শত হস্ত দূরে থাকা শহরবাসীর কাছে হাতি এত শ্রদ্ধা বা ভয় কোনওটাই দাবি করতে পারে না। হাতি আমাদের কাছে মজা, এন্টারটেইনার মাত্র। হাতি প্রায় প্রতিদিন আত্মসম্মান সহ নিজের বাসস্থান নিজের মত করে ফিরে পেতে কোনও না কোনও

বিক্ষোভ প্রতিবাদ করে। যেমন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মিড ডে মিলের চালের ঘর ভেঙ্গে দেওয়া, মুদি দোকান গুঁড়িয়ে আটা বা ডাল নষ্ট করা প্রভৃতি। বনবাসি মানুষের ঘরদোর তছনছ করে বেঘর করে দেওয়া নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। সারা ভারতের তুলনায় উত্তরবঙ্গে এ ধরনের ঘটনার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। সম্প্রতি হাতির এরকম মেজাজ মর্জির কারণ খুঁজতে গিয়ে 'ওয়াইল্ড লাইফ ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া' (Wild Life Trust Of India), 'প্রোজেক্ট এলিফ্যান্ট' এবং ইংল্যান্ডের এনজিও 'এলিফ্যান্ট ফ্যামিলি, রাইট অফ প্যাসেজ' নামক একটি ৮০০ পৃষ্ঠার গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছে। তাদের গবেষণায় হাতি চলাচলের পথ কেমন ছিল এবং এখন কেমন হয়েছে তার বিবরণ আছে।

গবেষণা থেকে হাতি মানুষ দ্বন্দ্ব কেন এমন রূপ পেল তার একটা স্পষ্ট চিত্র ফুটে ওঠে। হাতির দলগুলি সংসার পাতা, খাওয়া-দাওয়ার সামগ্রী যোগাড় করা, রাতে ঘুমানো, খেলতে যাওয়া বা চড়ে বেড়ানোর জন্য সারা বছর ৩০০ বর্গকিলোমিটার থেকে ৫০০ বর্গকিলোমিটার অরণ্য জুড়ে ঘরবাড়ি, উঠোন বা বাসস্থান চায়। শত শত বর্গকিলোমিটার বনানী ব্যাপ্ত উঠোনের নির্দিষ্ট কতকগুলি পথ দিয়েই হাতির দল এঘর ওঘর চলাচল করে। এই নির্দিষ্ট গুটিকয়েক পথকেই বলে 'এলিফ্যান্ট করিডোর' বা হাতির চলাচলের পথ। করিডোর বা হাতির চলাচলের পথগুলি বৃহৎ আয়তনের অরণ্যের সাপেক্ষে প্রশস্তে এক কিলোমিটারের কম বা সর্বোচ্চ তিন-চার কিলোমিটার হয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী এভাবেই প্রজন্মের পর প্রজন্ম হাতি তার করিডোরগুলি জন্মগত অধিকারে এবং স্বভাবদলিলিকৃত মালিকানায় ব্যবহার করে বেঁচেবর্তে ছিল।

মানুষ পৃথিবীর স্বঘোষিত মহান জীব (?) এসে ঘোষণা করল ও সব ওমুক (কেন্দ্রীয়) সরকারের বা তমুক (রাজ্য) সরকারের। গাছের বাড়ি, হাতির বাসস্থানের মালিক রাজা বাদশা থেকে আজ কেন্দ্রীয় বনদপ্তর, রাজ্য বনদপ্তর বা রাজস্বদপ্তর বলে ফরমান জারি হল। একবার যা মানুষের, তাতে আর কারও পাশাপাশি থাকার কোনও অধিকার নেই। ক্রমোচ্চবিন্যাস বা হায়ারার্কির ধারণায় বন্য জীব হয়ে গেল পশু অর্থাৎ নিকৃষ্ট। না আছে তার বেঁচে থাকার সভ্য অধিকার, না থাকল তার ঘরদোর উঠোন নিয়ে সংসার পাতার পরিসরের ভাবনা। আগে মানুষ, পিছে মানুষ, মাঝে মানব-পদপৃষ্ট সব প্রাকৃতিক জীবকুল। একরকমের প্রাকৃতিক জীব হিসেবে অপরাপর জীবকুলের সাথে পাশাপাশি থেকে মানুষ নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখবে—এটাই কাম্য ছিল। কিন্তু এই বাস্তব ধারণা থেকে দূরে সরে শুধু জীবকুল ও তার ধারক প্রকৃতির ধ্বংসের নেশাই উন্নয়ন বলে মানুষ সদর্পে ঘোষণা করছে। ভারতবর্ষ জুড়ে হাতিকে মানুষ কিভাবে উন্নয়নের পায়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে তার অনেক পরিসংখ্যান, গদ্যে ছড়িয়ে আছে ''রাইট অফ প্যাসেজ'' বা ''একফালি পথের অধিকার'' গবেষণাপত্রে। গবেষকরা জানাচ্ছেন ভারতবর্ষে ২০০৫ সালেই হাতির চলাচলের পথসংখ্যা ছিল ৮৮টি কিন্তু ২০১৭ সালে ১৩টি বেড়ে হয়েছে ১০১টি। হস্তিযুথ তার একটি চলাচলের পথের জন্যে বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন আয়তনের অরণ্য ব্যবহার করে (যেমন দক্ষিণ ভারতে ১৪১০ বর্গকিলোমিটার প্রতি একটি করিডোর, উত্তরপূর্ব ভারতে ১৫৬৫ বর্গকিলোমিটার প্রতি একটি করিডোর, মধ্য ভারতে ৮৪০ বর্গকিমি প্রতি একটি করিডোর, উত্তরপশ্চিম ভারতে ৫০০ বর্গকিলোমিটার প্রতি একটি করিডোর। গবেষকদের মতে ভারতে মোট ১০১টি করিডোরের মধ্যে ২৮টি দক্ষিণ ভারতে, ২৩টি উত্তরপূর্ব ভারতে, ২৫টি মধ্য ভারতে এবং উত্তরপশ্চিম ভারতে ১১টি করিডোর আছে। সম্পূর্ণ ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে হাতির চলাফেরা করে সুস্থ জীবন যাপন করার জন্যে প্রতিদিন ৭০% করিডোর ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়ে। ২৫% পথ মাঝে মাঝে দরকার, ৫% হঠাৎ হঠাৎ।

করিডোরের বিবর্তন

আমাদের দেশে হস্তিগোষ্ঠীর বাসস্থানের উঠোন চিরে উন্নয়নের বিজয়রথ চলছে। জাতীয় সড়ক, রাজ্য সড়ক, রেলপথ, চা বাগান, কৃষিজমি তৈরি, কারখানা তৈরি—এককথায় যে যা চায়, তাই নির্বিঘ্নে ঘটিয়ে ফেলতে পারে। এভাবে গড় হিসাবে দেশের প্রতি তিনটি করিডোরের মধ্যে দুটিতেই মানুষ চাষ আবাদ শুরু করেছে। শতাংশের হিসেবে গড়ে ৬৯% করিডোর আটকে কৃষি উৎপাদন চলছে। মধ্য ভারতে ৯৬% করিডোর চাষের কবলে। রাজ্য বা জাতীয় সড়ক তৈরি করার সময় সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে তিনটি এলিফ্যান্ট করিডোরের মধ্যে দুটি করিডোর নষ্ট করেই সড়ক তৈরি করেছে। পাহাড়িপথে রেল লাইন, ক্যানাল তৈরিতে ১১ শতাংশ করিডোর নষ্ট হয়েছে। খনিজ সম্পদ আহরণ, পাহাড়ের বোল্ডার উত্তোলনের জন্য ১২ শতাংশ করিডোর ধ্বংস করা হয়েছে। আমরা গত এক দশকে প্রাকৃতিক বনজঙ্গলের ধরনধারণ বদলে দিচ্ছি। ফলে হাতির চলার পথে উন্নয়ন দাঁড়িয়ে হাতিকে একরকম চোখ রাঙিয়ে বাধ্য করছে তাদের চলাচলের চিরাচরিত পথ ছেড়ে দিয়ে বিকল্প পথ খুঁজে নিতে। গবেষকদের মতে হাতিরা অত্যাচারিত হয়ে তাদের বহুল ব্যবহৃত সাতটি পথে যাওয়া আসা একেবারেই স্থগিত রেখেছে। বদলে ২০টি নতুন পথ খুঁজে নিয়েছে। চারপাশ দিয়ে উন্নয়ন ধেয়ে এসে এলিফ্যান্ট করিডোরগুলির মুখ বোতলের ছিপির মত বন্ধ করে দিয়েছে। ২০০৫ সালে ১ কিলোমিটার বা তার কম পরিসরের জন্য এলিফ্যান্ট করিডোর ছিল ৪৫.৫ শতাংশ যেটা ২০১৭-তে বেড়ে হয়েছে ৭৪ শতাংশ। ১ কিমি থেকে ৩ কিমি দৈর্ঘ্যের চলাচলের পথ গত এক দশকে ১৯ শতাংশ কমে গিয়েছে। ২০০৫ সালে শুধুই বনানী আশ্রিত এলিফ্যান্ট করিডোর ছিল চব্বিশ শতাংশ, এবছর মাত্র ১২.৯০ শতাংশ। গত ত্রিশ বছরে দ্রুত গতির রেলগাড়ি হাতি করিডোর জবরদখল করে হাতি যুথের দেহের উপর দিয়ে রেলগাড়ি চালিয়ে ২৬৬টি হাতিকে পিষে মেরেছে।

উত্তরবঙ্গে হাতি ঘেটো

ভারতের মধ্যে উত্তরবঙ্গে হাতি-মানুষ সমর অবস্থা খুবই উদ্বেগজনক। উত্তরবঙ্গে তিনটি জেলা, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহারে নয়টি ফরেস্ট ডিভিশনের মোট অরণ্য এলাকা ৩০৫১ বর্গকিলোমিটার। তার মধ্যে ২২০০ বর্গকিলোমিটার এলাকায় প্রায় ৩০০টি হাতি বাসস্থান গড়ে

তুলছে। ভারতবর্ষের মোট হাতির এক শতাংশ আছে উত্তরবঙ্গের তরাই-ডুয়ার্স অঞ্চলে। মেচি নদী থেকে ভুটান আসাম সীমান্তে সঙ্কোস নদী অবধি বিস্তৃত অরণ্যে হাতি করিডোরের সংখ্যা ১৪টি। উত্তরপূর্ব ভারতের তুলনায় ভাবলে উত্তরবঙ্গে হাতি করিডোর থাকা উচিত মাত্র ২টি। উত্তরবঙ্গের এত অপরিসর অরণ্যে প্রতি ১৫০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের অরণ্য পিছু একটি করে এলিফ্যান্ট করিডোর। এই ১৪টি এলিফ্যান্ট করিডোরের মধ্যে ৮৬ শতাংশ করিডোর হস্তিযূথ প্রাত্যহিক প্রয়োজনে ব্যবহার করে। উত্তরবঙ্গের ৩৫.৭০ শতাংশ এলিফ্যান্ট করিডোর নষ্ট করে রেলগাড়ি যাতায়াত করছে। ১০০ শতাংশ করিডোরের মুখ আগলে কোন না কোন চাষ আবাদের কাজ চলছে। সর্বভারতীয় গড় ৭০%। চা-বাগান, মানুষের বসতি, রেল লাইন, জাতীয় সড়ক প্রভৃতি এলিফ্যান্ট করিডোরের উপর অদৃশ্য দেওয়াল তুলে দিয়েছে। উত্তরবঙ্গে হাতিদের স্বাভাবিক বাসস্থান অরণ্য আজ বৃহৎ মাপের জেলখানা বা প্রাকৃতিক কুঠুরিতে পরিণত হয়েছে। হাতিগোষ্ঠীকে তরাই-ডুয়ার্স জঙ্গলে ঘেটোতে (Ghetto) বন্দী জীবনযাপন করতে বাধ্য করা হচ্ছে। দিন যাচ্ছে ঘেটোবন্দী জীবন হাতি মেনে নিচ্ছে না। মানুষ ও মানুষের প্রগতির সাথে হাতির সংঘর্ষে সারা ভারতবর্ষে প্রতি বছর ১০০টি হাতি শহীদ হচ্ছে। প্রায় ৪৫০ জন সাধারণ মানুষের জীবনে আকস্মিক যবনিকা নেমে আসছে। সারা দেশের তুলনায় উত্তরবঙ্গে সাধারণ মানুষের বাৎসরিক মৃত্যুর ঘটনা সবচেয়ে বেশি। প্রতি বছর প্রায় ৫০ জন মানুষ হাতির শুঁড়ের আছাড়ে বা পদপৃষ্ট হয়ে মৃত্যুবরণ করছে।

হাতির করিডোর রক্ষায় পদক্ষেপসমূহ

ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেসন সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া (WCS) পক্ষ থেকে বিজ্ঞানী বিদ্যা আত্রেয় (Vidya Athreya) হাতির করিডোর রক্ষার জন্য সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে একটি জনস্বার্থ মামলা করেন। সুপ্রীম কোর্ট নয়টি হাতি অধ্যুষিত রাজ্যকে অতি জরুরি (High Alert) ভিত্তিতে ২৭টি এলিফ্যান্ট করিডোরের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্যে পুনর্বাসনের নির্দেশ দিয়েছে। হাতির করিডোর পুনর্বাসনের জন্য ২০০৩ সালে ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড ফর এনিম্যাল ওয়েলফেয়ার এবং ওয়াইল্ড লাইফ ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া যৌথভাবে ২৫.৫ একর জমি অধিগ্রহণ করে ২০০৭ সালে কর্ণাটক সরকারের হাতে তুলে দেন। রাজ্য বনদপ্তর, মিনিস্ট্রি অফ এনভায়রনমেন্ট ফরেস্ট এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ (MOEFCC), ওয়াইল্ড লাইফ অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য সংরক্ষণ সংস্থার চেষ্টায় মাত্র আটটি (৮টি) এলিফ্যান্ট করিডোরের সুরক্ষা নিশ্চিত করা গিয়েছে। সুরক্ষিত পথগুলি হাতিদের চলাচলের জন্য দ্রুত যোগ্য করে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে। ''রাইট অফ প্যাসেজ'' গবেষক গোষ্ঠীর মতে ১২টি হাতি অধ্যুষিত রাজ্যের অরণ্যবাসীদের প্রমাণ সাইজের হাতির পুতুল তৈরি করে ''গজ-যাত্রা'' নামক সচেতনতামূলক পরিক্রমা বের করে মানুষ-হাতি সংঘর্ষের কারণগুলি প্রচার করা দরকার।

বনবাসী উচ্ছেদ ও হাতি

হাতিদের চলাচলের পথগুলি সংরক্ষণ খুব জরুরি। কিন্তু বনবাসী উচ্ছেদ করে সেই কাজে সফলতা লাভ আদৌ কি সম্ভব? বনবাসীরা অরণ্যের স্বাভাবিক সন্তান এবং অভিভাবকও বটে। যারা বনের বৃক্ষরাজি, পশুপাখির সাথে পাশাপাশি বেঁচে থেকে এসেছে আবহমান কাল থেকে। স্বাভাবিকভাবে বনকে রক্ষা করে নিজেরা বেঁচে আছে। সরকারি নির্দেশে এবং প্রগতি মরীচিকার চাপে পথভ্রষ্ট হয়ে তারা আজ বনের স্বতস্ফূর্ত রক্ষাকারী থাকতে পারছে না। সরকার এই ধরনের প্রাকৃতিক প্রহরীকে সরিয়ে যথেষ্ট বনরক্ষী নিয়োগ করতেও পারছে না। সরকার, বনরক্ষাকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি ও সচেতন সাধারণ নাগরিকের উচিত বনবাসীদের স্বাভাবিক বন রক্ষার জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে এলিফ্যান্ট করিডোর রক্ষার কোনও সমাধান খুঁজে বের করা। প্রচলিত প্রগতির ধারাকে লাগাম পরিয়ে কোনও বিকল্প ভাবনায় আমরা যৌথভাবে পৌঁছতে না পারলে এলিফ্যান্ট করিডোর রক্ষার আর কোনও আশা নেই।

আমাদের এখনই উচিত হাতি গোষ্ঠীদের চলাচলের পথগুলি ফিরিয়ে দেওয়া। নইলে যে অরণ্য বৃক্ষরাজির মাথায় কিরণ ছড়িয়ে সূর্য উদিত হয় সেখানে বালির চিক্‌চিক্ প্রতিফলনে সেই সূর্য অস্তমিত হবে।

Email : ramjbhowmik@gmail.com., M. 9933188054

ছবি : রাজা রাউত

ছবি : সম্রাট সরকার

স ম র কু মা র বা গ চী

হাতে কলমে বিজ্ঞান : বায়ুর চাপ ও তাপ

বেলুনের গায়ে কাপ আটকে রাখা

❒ **কী কী লাগবে**

দুটি কাপ এবং একটি বেলুন।

❒ **কী করতে হবে**

তোমার কাজ হবে কাপ দুটিকে বেলুনের সাহায্যে আটকে ঝুলিয়ে রাখা। তুমি কিন্তু কাপ দুটিকে বেলুনের সঙ্গে বেঁধে দিতে পারবে না। তাহলে কাজটি কীভাবে করবে? প্রথমে দুটি কাপের মধ্যে বেলুনটির কিছু অংশ ঢুকিয়ে দাও। তারপর বেলুন ফোলাতে থাকো। কাপের ভেতর বেলুনটি পুরোপুরি ফুলে উঠলে তুমি বেলুনটিকে ঝুলিয়ে দিতে পারো।

❒ **কী ঘটছে**

বেলুন কিছুটা ফোলার পর কাপের মধ্যে যেটুকু বাতাস ছিল তার বাইরে বেরোবার পথ বন্ধ হল। বেলুন যত ফুলতে থাকল ততই বেলুনের ব্যাস বাড়ল। এর ফলে কাপের মধ্যে বদ্ধ বাতাসের প্রসারণ ঘটল। ফলে ভেতরের বায়ুর চাপ কমে গেল। তখন বাইরের সাধারণ বায়ুর চাপ বেলুনকে কাপের মধ্যে চেপে ধরল। এ ছাড়াও বেলুন ও কাপের মধ্যে ঘর্ষণ বেলুনকে কাপের সঙ্গে আটকে থাকতে সাহায্য করে।

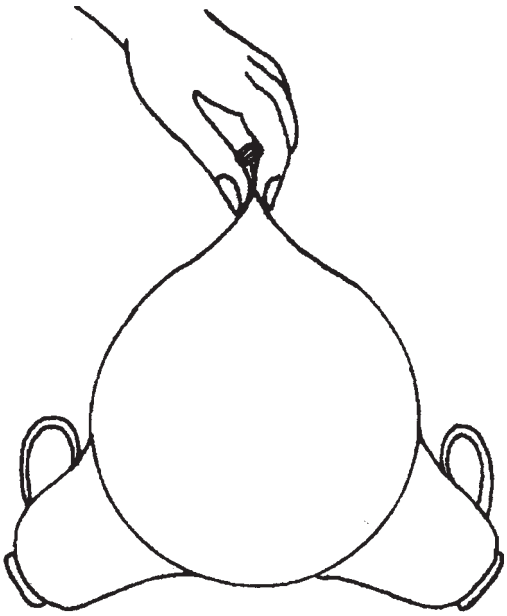

একশো টাকার নোট পোড়ানো

❒ **কী কী লাগবে**

জল মিশ্রিত অ্যালকোহল ও একটি টাকার নোট।

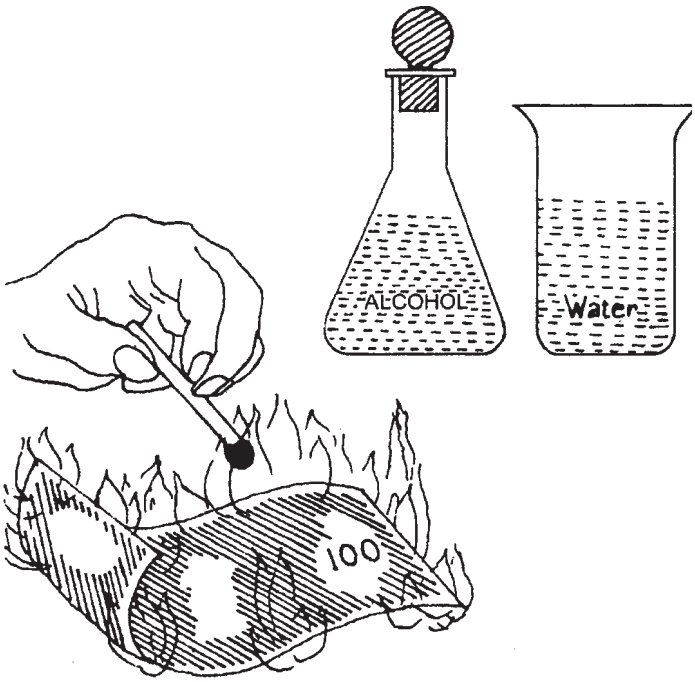

❒ **কী করতে হবে**

সমানুপাতে জলের সঙ্গে অ্যালকোহল মেশাও। নোটটি ওই মিশ্রিত তরলে ডোবাও। এটি ভিজে গেলে তুলে ফেলো এবং একটি জ্বলন্ত দেশাই কাঠি এর কাছে আনো। নোটটি শিখাসহ জ্বলতে থাকবে। কিছুক্ষণ পরে আগুন নিভে যাবে কিন্তু নোটটি আগের মতই অক্ষত থাকবে। কেন এরকম ঘটবে?

❒ **কী ঘটছে**

অ্যালকোহল হচ্ছে উচ্চ উদ্বায়ী তরল। ঘরের স্বাভাবিক তাপমাত্রাতেই এটির বাষ্পীভবন ঘটে। অ্যালকোহল বাষ্পের জ্বলনাঙ্ক (Ignition temperature) খুব কম। এইজন্য বাষ্পটিতে সহজেই আগুন ধরে যায়। অ্যালকোহল দহনের ফলে উদ্ভূত তাপের বেশিরভাগ পরিমাণই চারপাশের বায়ুতে ছড়িয়ে পড়ে। কিছুটা পরিমাণ তাপ অ্যালকোহলের বাষ্পীভবনের জন্য ব্যবহৃত হয়। উপরন্তু, নোটটিতে যে জল আছে তা তাকে তাপ থেকে বাঁচায়। এইজন্য, আগুন জ্বলা সত্ত্বেও নোটটি পুড়ে যায় না।

Email : samar.bagchi@yahoo.com, M. 9433526839

অ নি ন্দ্য দে

ভারতে উদ্ভিদবিদ্যার জননী : জানকী আম্মাল

সময়টা উনিশ শতকের একেবারে শেষ ভাগ। তৎকালীন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির সাব-জজ তখন দেওয়ান বাহাদুর ই. কে. কৃষ্ণ। থাকতেন কেরালার তেল্লিচেরিতে। সংস্কৃতিমনস্ক কৃষ্ণ আধুনিক বিজ্ঞান আর সাহিত্যের বই দিয়ে ভরে তুলেছিলেন তার ব্যক্তিগত লাইব্রেরি। তার সঙ্গে ছিল বাগান করার সখ। ১৮৯৭ সালে তেল্লিচেরির ঐ বাড়িতেই কৃষ্ণর স্ত্রী দেবিয়াম্মার কোল আলো করে জন্ম নিল ফুটফুটে একটা মেয়ে। নাম রাখা হল জানকী। পোষাকি নাম এডাভালেথ কক্কাত জানকী আম্মাল। একটু বড় হতেই সবাই বুঝতে পারল বাবার হাতে তৈরি বাগানটাই জানকীর সবচেয়ে প্রিয় খেলার জায়গা। আর সেখানে খেলতে খেলতেই কখন যেন গাছপালার প্রেমে পড়ে গেল ছোট্ট জানকী।

জানকী আম্মাল

তেল্লিচেরিতে স্কুলের পাঠ শেষ করে জানকী ভর্তি হল মাদ্রাজের কুইন মেরিজ কলেজে। সেখান থেকে স্নাতক হয়ে চলে এলেন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজে। সেখানকার শিক্ষকদের প্রভাবে জানকীর উদ্ভিদপ্রেম আরও গভীরতা পেল, মাথায় ঢুকল স্বাভাবিক পরিবেশে উদ্ভিদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে গবেষণার চিন্তা। ১৯২১ সালে উদ্ভিদবিদ্যায় সাম্মানিক ডিগ্রি নিয়ে পড়াতে শুরু করলেন মাদ্রাজের উইমেনস্ ক্রিশ্চিয়ান কলেজে। এ সময়ে, ১৯১৭ সাল থেকে এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার জন্য আমেরিকার মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় বারবার বৃত্তি প্রদান শুরু করেন। সেই বৃত্তি নিয়ে জানকী পাড়ি দিলেন মিশিগান। ১৯২৫ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে ফিরে এলেন মাদ্রাজে।

১৯৩১ সালে প্রথম ওরিয়েন্টাল বারবার ফেলো হিসেবে জানকী আবার গেলেন মিশিগান, পেলেন ডি.এস.সি. ডিগ্রি। ফিরে এসে যোগ দিলেন তৎকালীন ত্রিবান্দ্রমের মহারাজা কলেজ অফ সায়েন্সে। ১৯৩২ থেকে ১৯৩৪ পর্যন্ত সেখানে কাজ করলেন উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক হিসেবে।

স্বাধীনতা আন্দোলনের তীব্রতায় ভারতবর্ষ তখন প্রবলভাবে আলোড়িত। পাপুয়া ও নিউ গিনি থেকে আমদানির পরিবর্তে আখ উৎপাদনে ভারতকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার দাবি জানিয়ে যাচ্ছিলেন পন্ডিত মদনমোহন মালব্য। শেষ পর্যন্ত তার উদ্যোগেই কোয়েম্বাটোরে তৈরি হল আখ উৎপাদন কেন্দ্র। শিক্ষকতা ছেড়ে জিনতাত্ত্বিক হিসেবে জানকী যোগ দিলেন সেখানে।

বিশ শতকের গোড়ার দিক থেকেই গম আর আখের জিন সংক্রান্ত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা শুরু হয়েছিল। কোয়েম্বাটোরের আখ উৎপাদন কেন্দ্রে সি. এ. বারবার এবং টি. এস. ভেঙ্কটরামন আখ উৎপাদনের গবেষণা শুরু করলেন। ভেঙ্কটরামন তৈরি করলেন CO 419 প্রজাতির কোয়েম্বাটোর আখ। খরা এবং রোগের আক্রমণ যুঝতে সক্ষম এই আখের উৎপাদন শুরু হয়ে গেল ভারতের অন্যান্য অংশে এবং ভারতের বাইরে বিভিন্ন দেশেও।

এখানে জানকীর গবেষণায় জন্ম নিল ভিন্ন বর্গের বেশ কিছু সংকর জাতের আখ। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটা নাম স্যাকারাম জিয়া, স্যাকারাম এরিঅ্যানথাস, স্যাকারাম ইম্পেরাটা, স্যাকারাম সরগাম ইত্যাদি। এই গবেষণাগারে আখের কোশের জিনগত উপাদান ও তার রূপ সংক্রান্ত কাজকর্ম অর্থাৎ সাইটোজেনেটিক্স সংক্রান্ত জানকীর গবেষণা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানেই জানকীর নেতৃত্বে আখ এবং বাঁশের মত ঘাসজাতীয় উদ্ভিদের সংকর তৈরির কর্মকান্ড এককথায় অবিস্মরণীয়।

কিন্তু দুঃখের বিষয় বিজ্ঞানের জগৎটাকে তখনও পুরুষের আধিপত্যের জায়গা হিসেবেই ভাবা হত। কোয়েম্বাটোরের গবেষণাগারে জানকীর পুরুষ সহকর্মীরা তার সাথে কাজ করতে রীতিমতো অপছন্দই করতেন। বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এক মহিলার কাছে পিছিয়ে পড়ার অভিঘাতটা সহ্য করতে না পেরে তারা জানকীর সাথে অসহযোগিতাও শুরু করেন। জানকীও বুঝতে পেরেছিলেন যে এই পরিবেশে কাজ চালিয়ে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আখ উৎপাদন কেন্দ্রের সাথে পাঁচ বছরের সম্পর্ক ছিন্ন করে ১৯৪০ সালে পাড়ি দিলেন লন্ডনে। অ্যাসিস্ট্যান্ট সাইটোলজিস্ট হিসেবে যোগ দিলেন জন ইনেস হর্টিকালচারাল ইনস্টিটিউশনে। ১৯৪৫ সালে যোগ দিলেন রয়্যাল হর্টিকালচারাল সোসাইটির সাইটোলজিস্ট হিসেবে। কিন্তু পরিস্থিতি তখন অগ্নিগর্ভ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। শোনা যায় বোমার আঘাতে জানালার কাঁচ ভেঙ্গে যখন ঘরে ছড়িয়ে পড়ত, তখন তাকে আশ্রয় নিতে হত খাটের নীচে। সেই ভয়ংকর সময়েও বিদেশের মাটিতে বসে অসীম সাহসের সঙ্গে উদ্যান উদ্ভিদের চর্চা করে চললেন জানকী।

মিশিগানে পড়ার সময় থেকেই জানকীর ঝোঁক ছিল সাইটোলজি নিয়ে গবেষণা করার। সে সময়ে এই বিষয়টা নিয়ে গবেষণা সবেমাত্র শুরু হয়েছে। ভাবনা-চিন্তাটা সীমাবদ্ধ ছিল কোশের নিউক্লিয়াস আর ক্রোমোজোম সংক্রান্ত বিষয়েই। ইংলন্ডে থাকাকালীন জানকী বেশ কিছু উদ্যান উদ্ভিদের ক্রোমোজোম সংক্রান্ত গবেষণা করেন। কোশে ক্রোমোজোমের সংখ্যা সংক্রান্ত তার গবেষণা উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রজাতির বিবর্তনের ধারাকে বুঝতে দারুণ সাহায্য করেছে। পরবর্তীকালে ভারতে ফিরে এসেও এ বিষয়ে গবেষণা চালিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। ইংলন্ডে

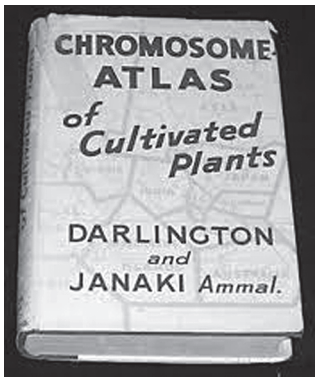

বসেই জগদ্বিখ্যাত উদ্ভিদবিদ্ সি. ডি. ডারলিংটনের সাথে লিখলেন *The Chromosome Atlas of Cultivated Plants* বইখানি, ১৯৪৫ সালে। উদ্ভিদের নানা প্রজাতির উপর তার বিভিন্ন গবেষণার কথা ধরা আছে সেই বইতে। ম্যাগনোলিয়ার সাইটোজেনেটিক্স সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার স্বীকৃতি হিসেবে এ সময়েই ম্যাগনোলিয়ার একটি প্রজাতির নাম রাখা হয় ''ম্যাগনোলিয়া কোবাস জানকী আম্মাল''। ভারতীয় বিজ্ঞানী হিসেবে জানকীর এ এক বিরল সম্মান।

ম্যাগনোলিয়া

এর মধ্যে বিশ্ব রাজনীতিতে ঘটে গেল বিরাট পরিবর্তন। বিশ্বযুদ্ধ শেষ হল। স্বাধীন হল ভারতবর্ষ। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হলেন জওহরলাল নেহরু। ১৯৫১ সালে বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার পুনর্গঠনের জন্য পন্ডিত নেহরু ডেকে পাঠালেন জানকীকে। আজন্ম ভারতীয় ঐতিহ্যে বিশ্বাসী, নিঃস্বার্থ, গান্ধীর আদর্শে অনুপ্রাণিত জানকী তৎক্ষণাৎ ফিরে এলেন স্বদেশে। ১৯৫৪ সালে বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার কলকাতা অফিসের পুনর্গঠনের কাজেও হাত দিয়েছিলেন জানকী। পরবর্তী সময়ে কাজ করেছেন এলাহাবাদের সেন্ট্রাল বোটানিক্যাল ল্যাবরেটরির অধিকর্তা হিসেবে, জম্মুর রিজিওন্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরির অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি হিসেবেও। অল্প কিছুদিনের জন্য কাজ করেছেন মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার অফ অ্যাডভান্সড স্টাডিজ ইন বোটানির এমেরিটাস সায়েন্টিস্ট হিসেবে। সেখানে নিজের উদ্যোগে তৈরি করেছিলেন ভেষজ উদ্ভিদের এক চমৎকার বাগান।

জানকীর এই পর্বের গবেষণায় দেখা গেল মৌলিক চিন্তা-ভাবনার অসামান্য দ্যুতি। জানকী দেখলেন বিবর্তনের লম্বা রাস্তায় ঠান্ডা আর্দ্র উত্তর-পূর্ব হিমালয়ে নতুন নতুন প্রজাতির উদ্ভিদের জন্মের হার তুলনায় অনেক বেশি; ঠান্ডা শুষ্ক উত্তর-পশ্চিম হিমালয়ে এই হার অনেকটাই কম। কিন্তু কেন? উত্তরটা খুঁজে বের করলেন জানকী। সাধারণত বেশিরভাগ প্রজাতির উদ্ভিদের কোশে জোড়ায় ক্রোমোজোম থাকে। কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে উদ্ভিদ কোশে তিন বা তার গুণিতক হিসাবে ক্রোমোজোমও থাকে। কোষের এই অবস্থাটাকে বলা হয় পলিপ্লয়ডি। জানকী দেখালেন উত্তর-পূর্ব হিমালয়ে নতুন প্রজাতির উদ্ভিদের জন্মহার বেশি এই পলিপ্লয়ডির কারণেই। তিনি প্রমাণ করে দেখিয়েছেন, চিন ও মালয়দেশের উদ্ভিদের সাথে উত্তর-পূর্ব ভারতের উদ্ভিদের সঙ্গমে স্বাভাবিক সংকর তৈরি হয়েছে বলেই এ অঞ্চলে গাছপালার বৈচিত্র্যও অনেক বেশি।

উদ্ভিদবিদ্যায় নিবেদিতপ্রাণ জানকী আম্মাল বাস্তুতন্ত্র ও জীববৈচিত্র্য রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন। পরিবেশ আন্দোলনেও তার ভূমিকা রীতিমতো উল্লেখযোগ্য। জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে তোলার জন্য কেরালার সাইলেন্ট ভ্যালিতে কুন্তীপুজা নদীর উপর বাঁধ তৈরির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন জানকী।

কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর নেওয়ার পরও গবেষণার কাজ চালিয়ে গেছেন বেশ কিছুদিন। এই পর্বে মূলতঃ তার গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল ভেষজ উদ্ভিদ। আবার জিনতত্ত্ব ও বিবর্তনের মত বিষয়ও অবলীলায় ঢুকে পড়েছে তার গবেষণার চৌহদ্দিতে। পুজো-অর্চনায় এবং ভেষজ হিসেবে গাছপালার ব্যবহার সম্পর্কে যুগ যুগ ধরে মানুষের জ্ঞানের যে পরম্পরা, তা নিয়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের টেকনিক্যাল নাম রাখা হয়েছে এথনোবোটানি। জানকীর গবেষণার অন্যতম বিষয়ও ছিল এই এথনোবোটানি। ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী বিভিন্ন উদ্ভিদের অস্তিত্ব নিয়ে যে পড়াশোনা, যাকে বলা হয় ফাইটোজিওগ্রাফি, জানকী আম্মালকে আমরা খুঁজে পাই সেখানেও।

শেষ জীবনে থাকতেন মাদ্রাজের কাছে মাদুরাভয়ালে কেন্দ্রীয় ক্ষেত্র গবেষণাগারে। ১৯৮৪ সালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন সেখানেই। জীবনে সম্মান পেয়েছেন অনেক। ১৯৫৭ সালে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স অ্যাকাডেমির ফেলো নির্বাচিত হন। ১৯৭৭ সালে ভারত সরকার তাকে সম্মানিত করেন পদ্মশ্রী পুরস্কারে। মৃত্যুর বেশ কিছুদিন পরে, ২০০০ সালে ভারত সরকারের পরিবেশ ও বন দপ্তর ট্যাক্সোনমি সংক্রান্ত জাতীয় পুরস্কারও চালু করা হয় তার নামে। কিন্তু কোনও কিছুই তার নিতান্ত আটপৌরে জীবন-যাপনে ছাপ ফেলতে পারেনি। বিজ্ঞান সাধনার প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা আর নৈতিক উৎকর্ষই ছিল তার জীবনের মূল মন্ত্র। ১৯৫৬ সালে মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় বোটানি ও সাইটোজেনেটিক্স-এ তার অবদানের জন্য তাকে সাম্মানিক এল.এল.ডি. পুরস্কার প্রদান করেন। সেই শংসাপত্রে যে কথাগুলো লেখা হয়েছিল, জানকী আম্মালকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য সেটাই বোধ হয় সর্বোত্তম উক্তি—

''অক্লান্ত পরিশ্রম আর নির্ভুল পর্যবেক্ষণের ক্ষমতায় বলীয়ান এই মহীয়সী নারী এবং তার সযত্ন উদ্যম, আন্তরিক ও নিবেদিতপ্রাণ বিজ্ঞানকর্মীর মডেল হিসেবে প্রতীয়মান''।

Email : anindya05@gmail.com., M. 9432220412

ম নো তো ষ মি ত্র

একই অঙ্কে কতরূপ

একটি অতি সাধারণ গাণিতিক সমস্যা নিয়েই শুরু করা যাক। যেমন,— ‘‘দুটি কলার দাম চার টাকা হলে পাঁচটি কলার দাম কত? নির্বিষ এই পাটিগাণিতিক সমস্যার কথা শুনে পাপান চেঁচিয়ে বলে উঠল—আমি পারব। বললাম—করে দেখাও। পাপান খাতা-পেন্সিল কাছে টেনে এক নিমেষে করে দেখাল। যেমন—

2 টি কলার দাম 4 টাকা

1 ” ” ” $\frac{4}{2}$ ”

$\therefore$ 5 ” ” ” $\frac{4}{2}\times 5 = 10$ টাকা

পাপানের অঙ্ক কথা নিঁখুত হয়েছে। উত্তরও একদম সঠিক।

বললাম—‘‘পদ্ধতির নাম জান?” বলল—‘‘হ্যাঁ, ঐকিক নিয়ম।” বললাম—‘‘ঠিক বলেছো। ইংরাজিতে বলে Unitary method.”

পাপান গতবার মাধ্যমিক পাশ করেছে। অঙ্কে একশোতে একশো। তাই উত্তর দেওয়ার জন্য খুব স্বতঃস্ফূর্ত। পাপানকে বললাম—রোজ কি দশ টাকায় পাঁচটা কলা পাওয়া যাবে? উত্তরে মাথা নেড়ে ‘হ্যাঁ’ বলে দিল। উত্তর শুনে হাসি চেপে বললাম—‘‘কলার দাম কি কোনদিন বাড়ে না বা কমেও না। প্রশ্ন শুনে পাপান যেন কেমন গম্ভীরভাবে তাকাল। ওর ভাব লক্ষ্য করে এরপর যখন বললাম—‘দশ টাকা দিলে রোজ তুমি বাজার থেকে পাঁচটা কলা আনতে পারবে?” এই প্রশ্নে পাপান যেন সম্বিৎ ফিরে পেল। তড়িঘড়ি উত্তর দিল—‘‘না, তা সম্ভব নয়।” সমস্যার গভীরতা বুঝতে পেরেছে ভেবে খুশি হলাম। বললাম—এই ক্ষেত্রে একটির দাম নির্ধারণ করে তার যে কোনও গুণিতকের মূল্য নির্ধারণ করা হয়। যেমন এক্ষেত্রে পাঁচটির (5) দাম নির্ধারণ করতে বলা হয়েছে। বিশেষীকরণের এই রূপকে বলে পাটিগণিত। অর্থাৎ The art and culture of constant numbers and reckoning by them in Arithmetic. তার সমস্যাটির সাধারণীকরণ রূপকে বলে বীজগণিত। যেমন—দুটি কলার দাম 4 টাকা হলে xটি কলার দাম কত? এর উত্তরে লিখি—

2 টি কলার দাম 4 টাকা

1 ” ” $\frac{4}{2}$ ”

$\therefore$ x ” ” ” $\frac{4}{2}\times x = 2x$ টাকা

এক্ষেত্রে, কলার সংখ্যা x এবং মূল্য বা দাম y হলে সমস্যাটির সাধারণীকরণ রূপ প্রকাশিত হয় $y = 2x$ সমীকরণ দ্বারা। x এর মান পরিবর্তন সাপেক্ষে বিভিন্ন সংখ্যক কলার দাম নির্ণয় অত্যন্ত সহজভাবে করা যাবে। কেবলমাত্র পাঁচটি কলা নয়, x এর যে কোন মান পরিবর্তনে, যে কোনও সংখ্যক কলার দাম নির্ধারণ করা যায় এক সেকেন্ডে। পাটিগণিতের অঙ্কে বীজগণিত খুঁজে পেয়ে পাপান খুব খুশি হল। এরপর বললাম—এবার পাটিগণিতের ভিতর লুকিয়ে থাকা জ্যামিতি দেখ। এই বলে একটা চিত্র আঁকলাম। চিত্র বুঝিয়ে বললাম— কলার সংখ্যা x-অক্ষ ও কলার মূল্য y-অক্ষ বরাবর প্রতিস্থাপিত করলে এই চিত্র পাওয়া যায়।

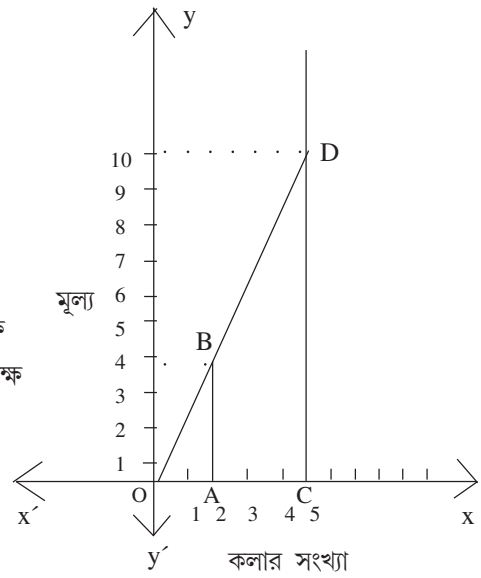

চিত্র—(i)

যেখানে,

OA = 2টি কলার সূচক

AB = 2 ” ” মূল্য

OC = 5 ” ” সূচক

CD = 5 ” ” মূল্য—যা নির্ণয় করতে হবে। ধরি CD = x. চিত্রে (i) এ ΔAOB ও ΔCOD পরস্পর সদৃশকোণী হওয়ায় অনুরূপ বাহুদ্বয় পরস্পর সমানুপাতী। অর্থাৎ—

$$\frac{AB}{OA} = \frac{CD}{OC} \text{ বা, } \frac{4}{2} = \frac{x}{5} \text{ বা } x = 10$$

x তথা কলার সংখ্যা এই মুহূর্তে 5। x এর মান পরিবর্তন সাপেক্ষে বিভিন্ন সংখ্যক কলার মূল্য নির্ধারণ করা যাবে। এটি একটি সাধারণীকরণ রূপ, তথা বীজগাণিতিক অভিমুখ। আবার, বিমূর্ত পাটিগাণিতিক এই সমস্যাটির বীজগাণিতিক সত্ত্বা তার নিজস্ব অবয়বে মূর্ত হয়ে উঠে জ্যামিতির জন্ম দেয়। বীজগণিতের অভিমুখে জ্যামিতির ছোঁয়া দেখে পাপান খুব উৎসাহিত হল। জিজ্ঞাসা করল—তাহলে জ্যামিতি কাকে বলে? এই প্রশ্নে আমি বললাম—জ্যামিতির সংজ্ঞা তোমার মনে পড়ে না? বলল সংজ্ঞাটা জানি। কিন্তু মানেটা অস্পষ্ট। বললাম যা জান তাই বল। বলল—‘জ্যা’ মানে পৃথিবী আর মিতি মানে পরিমাপ। আমি বললাম—সারা পৃথিবী জুড়ে ঐ একই ভাবে জ্যামিতির সংজ্ঞা দেওয়া হচ্ছে। ইংরাজিতে বলছে ‘Geo’ মানে ‘Earth’ আর ‘metry’ মানে ‘measurement’. ঐ একই কথার পুনরাবৃত্তি। বড় মর্মান্তিক। বিজ্ঞানের ভাষা উপলব্ধি না করলে আত্মস্থ করা যায় না। প্রচলিত সংজ্ঞার মাধ্যমে জ্যামিতি সম্পর্কে কিছু উপলব্ধি করা সত্যিই কষ্টকর। তখন পাপান বলল—তাহলে জ্যামিতি কি? বললাম—কোন গাণিতিক সমস্যার দৃশ্যগ্রাহ্য রূপই হল জ্যামিতি। চিত্র (i) হল পাটিগাণিতিক সমস্যাটির দৃশ্যগ্রাহ্য রূপ বা জ্যামিতি। পাপান অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে বলে উঠল—বাহ্! একই অঙ্কে পাটিগণিত-বীজগণিত-জ্যামিতি। এই কথায় বললাম—

এবার তাহলে বীজগাণিতিক সত্ত্বার লেখচিত্র দেখি। বলে একটি চিত্র অঙ্কণ করলাম y = 2x সমীকরণের।

x এর মান পরিবর্তনের সাপেক্ষে y এর পরিবর্তনগুলি জোড়ায় জোড়ায় লিখে তা প্রতিস্থাপিত করলে OC রেখা পাওয়া যায়।

x	1	2	3	4	..... to α
y = 2x	2	4	6	8	..... to α

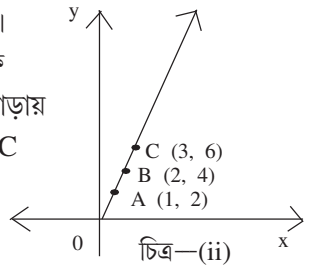

চিত্র—(ii)

(1, 2); (2, 4); (3, 6) ..... বিন্দুগুলি দ্বিমাত্রিক তলে প্রতিস্থাপিত করলেই মূল্যসূচক রেখা পাওয়া যায়। যা একটি সরলরেখা যার সমীকরণ y = 2x. যে রেখার প্রবণতা $\left(\frac{y}{x}\right) = 2$ বা ধ্রুবক বা অপরিবর্তনশীল। ফলে কলার মূল্য স্থির রাখে। যা পরিবর্তনশীল বাজার মূল্যের কথা স্বীকার করে না। ফলতঃ বাস্তব শিক্ষার পরিপন্থী হয়ে উঠে ক্রমশঃ। এই কথায় পাপান দ্বিগুণ উৎসাহিত হয়ে উঠল। বলল—একই অঙ্কে স্থানাঙ্ক জ্যামিতি যখন পাওয়া গেল, তাহলে ত্রিকোণমিতি নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। বললাম—সেই কথাই এবার বলব। এরপর বললাম—শোন কলার দাম তো আর স্থির থাকে না। দাম নিয়ত পরিবর্তিত হয়। কে পরিবর্তন করে। কিভাবে পরিবর্তিত হয়—এবার তা জানব। এই বলে বললাম (iii) নং চিত্র OBD রেখা হল মূল্য সূচকরেখা। যা O-কে কেন্দ্র করে ঘুরতে পারে। O-কে কেন্দ্র করে ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরলে OD দৈর্ঘ্যের মান কমার সাপেক্ষে দাম কমে। আর ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে ঘুরলে কেন্দ্রে কোণের বৃদ্ধির সাপেক্ষে OD দৈর্ঘ্যের মান বাড়ে ফলে দাম বৃদ্ধি পায়। পূর্বের y = 2x সমীকরণ থেকে পাই

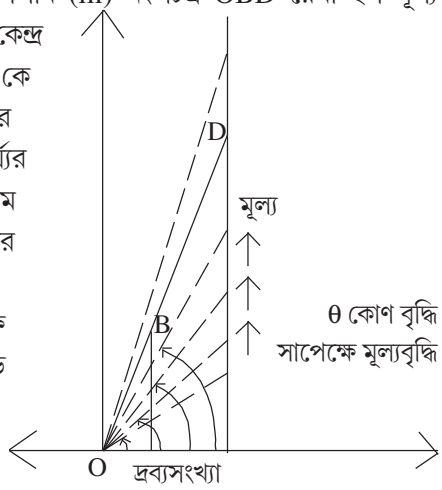

চিত্র—(iii)

$$\frac{y}{x} = 2 = \tan\theta = \frac{AB}{OA} = \frac{CD}{OC} [\text{চিত্র (i)}]$$

বা $\theta = \tan^{-1} y/x$

ফলে tanθ, θ এর মান বৃদ্ধি বা হ্রাসের হ্রাসের কারণে দাম বাড়ে বা কমে। tanθ-কে ঐ কারণে প্রবণতা (বৃদ্ধি বা হ্রাসের) বলে সূচিত করা হয়। তাহলে জ্যামিতির হাত ধরে ত্রিকোণমিতিও খুঁজে পাওয়া গেল। পাপান আনন্দে বলে উঠল—তাহলে বাদ থেকে গেল পরিমিতি। বললাম—তা কেন? ঐ (i) নং চিত্রে মূল্যসূচক রেখা যে OAB বা OCD ত্রিভুজ গঠন করেছে তার পরিসীমা ও ক্ষেত্রফল নির্ণয় করলেই পরিমিতির পাঠ পূর্ণ হয়।

ΔAOB এর পরিসীমা $= OA+AB+BO = 2+4+\sqrt{2^2+4^2}$

$= \left(6+2\sqrt{5}\right)$ একক

ΔCOD এর পরিসীমা $= OC+CD+OD$

$= 5+10+\sqrt{5^2+10^2} = \left(15+5\sqrt{5}\right)$ একক

ΔAOD এর ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2}\times OA\times AB = \frac{1}{2}\times 2\times 4 = 4$ বর্গএকক

ΔCOD এর ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2}\times OC\times CD = \frac{1}{2}\times 5\times 10 = 25$ বর্গএকক

এতসব দেখে পাপানের আনন্দ আর ধরে না। একই অঙ্কে পাটিগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, স্থানাঙ্ক জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, পরিমিতির ছোঁয়া। বললাম—দেখলে "একই অঙ্গে কত রূপ"। পাপান আনন্দে হাততালি দিল। এরপর হুর্-রে্-রে বলে চিৎকার করতে করতে বেরিয়ে গেল।

M. 9734695094

অ নি ন্দ্য দে

প্রাত্যহিক জীবনে বিজ্ঞান

ধূপকাঠির ধোঁয়া

জোরে বাতাস না বইলে জ্বলন্ত ধূপকাঠির ধোঁয়া প্রথমে কিছুদূর পর্যন্ত সিধে উঠে যায়। তারপর হঠাৎ কুন্ডলী পাকিয়ে যায়। বলতে পারেন কেন?

আসলে জ্বলন্ত ধূপকাঠি থেকে বেরোন গরম ধোঁয়া প্রথমে ধীরে ধীরে ওঠে। ফলে একটা শান্ত প্রবাহ থাকে। কিন্তু ধোঁয়া যত উপরে উঠতে থাকে, চারপাশের ঠান্ডা হাওয়া ততই তাকে উপরের দিকে ঠেলতে থাকে। ফলে এর গতি বাড়তে থাকে। বেশ কিছুটা উঠে যাওয়ার পর এর বেগ বেড়ে এমন হয় যাতে প্রবাহ অশান্ত হয়ে পড়ে। তৈরি হয় ঘূর্ণির।

মরিচের লাফ

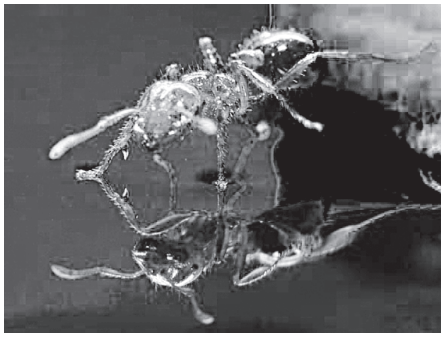

গ্লাসে জল নিয়ে তার উপর গোল মরিচের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিন। এবার কোনও সাবানে আঙুলের ডগাটা ঘষে নিয়ে সেটা দিয়ে জলতল স্পর্শ করুন। কি দেখবেন? দেখতে পাবেন মরিচ গুঁড়োগুলো ছিটকে স্পর্শবিন্দু থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কারণটা কি বলতে পারেন?

জলের মুক্ত পিঠ টান দেওয়া রবারের পর্দার মত আচরণ করে। সেই কারণেই পিঁপড়েরা জলের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারে, ডুবে যায় না। যে বল জলের উপরের তলকে এরকম টানটান করে রাখে তাকে বলে পৃষ্ঠটান। সাবান জলের পৃষ্ঠটান কমিয়ে দেয়। তাই এক্ষেত্রে আঙুলের সাবান গ্লাসের জলের পৃষ্ঠটান কমিয়ে দেবে। একটা টান দেওয়া পর্দার কোনও একটা জায়গা ফুটো করে দিলেপর্দাটা যেমন কুঁকড়ে সরে যায়, এখানেও তাই হবে। মরিচগুঁড়োগুলো ছিটকে স্পর্শবিন্দু থেকে দূরে সরে যাবে।

অমিতাভ চক্রবর্তী

নতুন গবেষণার অলিন্দে

মহাশূন্যের অদৃশ্য আভা ধরা পড়ল টেলিস্কোপে

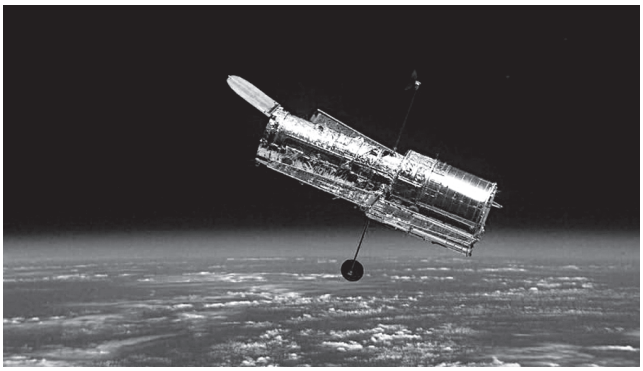

হাব্‌ল টেলিস্কোপ

ইউরোপিয়ান সাউদার্ন অবসাভেটরিতে (ESO) আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের একটি দল সম্প্রতি পর্যবেক্ষণ করছিলেন হাব্‌ল আল্ট্রা-ডীশ ফিল্ড (HUDF) অঞ্চলে। ফোরন্যাক্স (Fornax) নক্ষত্রমন্ডলের অন্তর্গত মহাকাশের এই অঞ্চলটিতে প্রায় দশ হাজারের বেশি গ্যালাক্সি রয়েছে। এখানেই গবেষকদল খুঁজে পেয়েছেন আদি মহাবিশ্বের পরিচয় বহনকারী এক অপ্রত্যাশিত বিকিরণ। তাঁদের মতে মহাকাশের প্রায় পুরো অঞ্চলই এইরকম অদৃশ্য দীপ্তিতে ভাস্বর। হাইড্রোজেনের মেঘ থেকে সেখানে যৎসামান্য লিম্যান-আলফা বিকিরণ দেখায়।

কয়েকশত আলোকবর্ষ দূরে থাকা হাজার হাজার গ্যালাক্সি থেকে আসা বিকিরণের এই চিত্র তুলে ধরতে হাব্‌ল টেলিস্কোপ একটানা ২৭০ ঘন্টার বেশি আলো সংগ্রহ করেছিল। গবেষকদলের অন্যতম সদস্য থিমিয়া নানায়াক্কারার মতে এটা সত্যিই এক বড় আবিষ্কার। এবার যখন আমরা কখনো তারায় ভরা পূর্ণ অমাবস্যার আকাশের দিকে তাকাব মনে মনে কল্পনা করব হাইড্রোজেন মেঘ থেকে বেরিয়ে আসা সেই অদৃশ্য আলোকে যা বিশ্বব্রহ্মান্ডের সৃষ্টিলগ্নের প্রথমদিককার ঘটনা হিসাবে এখনো মহাকাশের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।

মূল্যবান খনিজের সন্ধানে সমুদ্রের তলদেশে খোঁজ চালাচ্ছে রোবোট

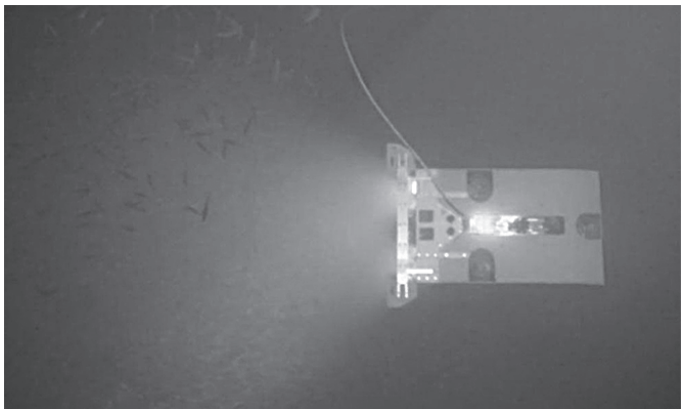

প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে সাথে বাড়ছে তাপ ও তড়িতের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন কতগুলি ধাতুর ব্যবহার। বিশেষতঃ ক্যামেরার লেন্স, স্মার্টফোনের স্ক্রিন, টিভি, ল্যাপটপ ইত্যাদিতে প্রায় ১৭ রকমের বিশেষ মৌল ব্যবহৃত হয়। ক্রমবর্ধমান এই চাহিদার কথা মাথায় রেখেই নরওয়ের বার্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক গ্রিনল্যান্ড ও নরওয়ের মাঝে সমুদ্রগর্ভে প্রায় আট হাজার ফুট নিচে রোবোট পাঠাচ্ছেন। সাধারণভাবে সাগরের তলদেশ বিরল মৃত্তিকা মৌলের (rare earth eliments) খনিজে সমৃদ্ধ থাকে। এখানকার পরিবেশ ভূমির গঠনবিন্যাস সম্পর্কে আরো তথ্য আহরণের উদ্দেশ্যেই তাদের এই অভিযান। এই গবেষকদলের মতে আমরা চাঁদ বা মঙ্গলের ভূপ্রকৃতি বা মানচিত্র সম্পর্কে যতটা ওয়াকিবহাল তার তুলনায় সাগরের তলদেশ সম্পর্কিত জ্ঞান আমাদের অনেক কম। আন্তর্জাতিক গবেষকদলটি জিঙ্ক, সোনা ও তামা সমৃদ্ধ অন্ধকার এই অঞ্চলটিকে আরো বিশদভাবে পর্যবেক্ষণ করতে রোবোটের পাশাপাশি সাবমেরিনকেও এই অভিযানে ব্যবহার করছেন। তাঁদের আশা প্রয়োজনীয় খনিজের সন্ধান ছাড়াও তাঁদের গবেষণা থেকে হয়তো আমরা জানতে পারব পৃথিবীর সব জায়গায় কেন সবরকম আকরিক পাওয়া যায় না।

Email : acnbu13@gmail.com., M. 9434377067

ড. বরুন কুমার দত্ত

অদৃশ্য শক্তির রহস্য

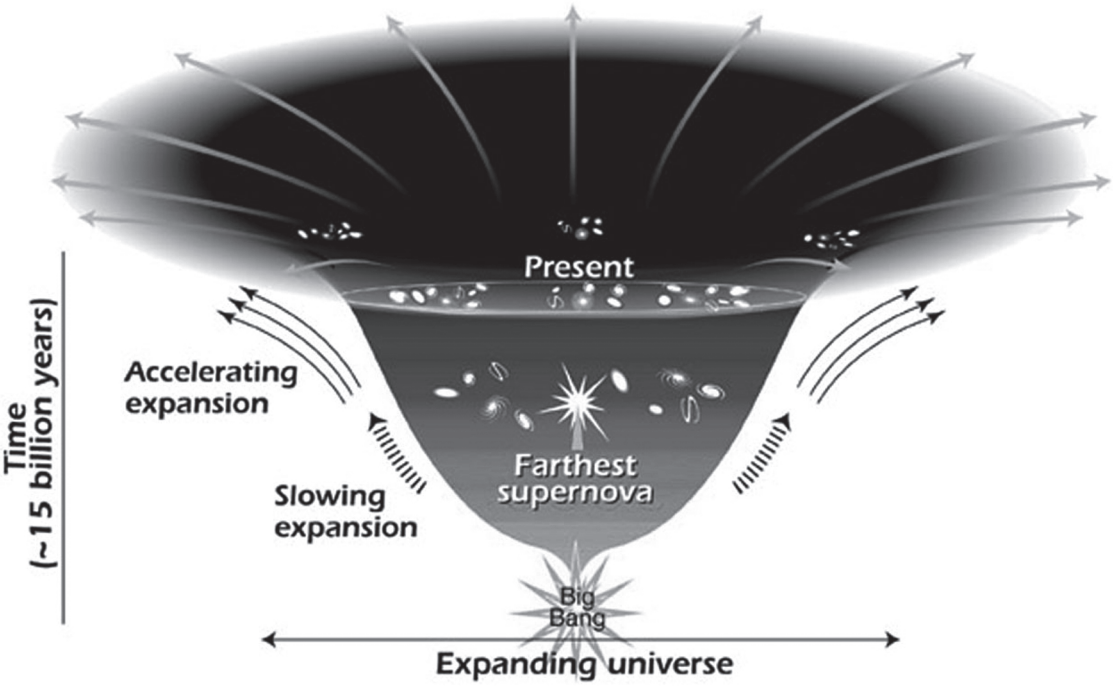

ছবিটিতে ১৫ বিলিয়ন (১ বিলিয়ন = ১০০ কোটি) বছর আগে মহাবিশ্বের জন্মের সময় থেকে তার প্রসারণের পরিবর্তনের হার নির্দেশ করছে। বক্রতা যত বেশি দ্রুত তার প্রসারণ। ৭.৫ বিলিয়ন বছর আগে এই পরিবর্তন দ্রুত হচ্ছে। মহাবিশ্বের বস্তুগুলি পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

বিশ্ব-ব্রহ্মান্ড সৃষ্টির আদিম লগ্নে এক মহাবিস্ফোরণ (Big Bang) ঘটেছিল বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। তার ঠিক পরেই অসীম দ্রুততার সঙ্গে মহাবিশ্বের প্রসারণ (Expanding Universe) আরম্ভ হল, যে প্রসারণ চলছে আজও। যার ফলে সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র, নীহারিকা ক্রমশ পরস্পরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। তাত্ত্বিকভাবে মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব এইসব ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে পারে। আইনস্টাইনের সাধারণ অপেক্ষবাদে এমনটাই ইঙ্গিত ছিল, কিন্তু প্রথমদিকে আইনস্টাইন সেটি মানতে চাননি। পরে অবশ্য নিজের ভুল শুধরে নিয়েছিলেন, তবে তা অন্য প্রসঙ্গ। মহাবিশ্বের প্রকৃত চালচিত্রটি ঠিক কেমন তা নিয়ে ডি-সিটার, ফ্রীডম্যান প্রমুখ বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা অনেক মূল্যবান তাত্ত্বিক গবেষণা করেছেন। তবে এর সঙ্গে কিছু প্রশ্নও ছিল।

১৯২৯ সালে, জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডুইন হাবল এক যুগান্তকারী পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক গবেষণায় জানালেন গ্যালাক্সিগুলি প্রচন্ড গতিতে ক্রমশ দূরে আরও দূরে সরে যাচ্ছে এবং মহাবিশ্বের আয়তন ফুঁ দেওয়া বেলুনের মতই বেড়ে চলেছে। অর্থাৎ মহাবিশ্বের স্থান-কাল ক্রমশই প্রসারিত হচ্ছে। বলা বাহুল্য হাবলের এই বিস্ময়কর আবিষ্কারে মহাবিশ্ব সম্পর্কে বিভ্রান্তি অনেকটাই দূর হল।

এবার আসা যাক রহস্যময় অদৃশ্য শক্তির প্রসঙ্গে। ১৯৯৮-৯৯ সালে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ ও মহাজাতিক মাপজোক করে জানতে পেরেছেন যে এই প্রসারণ ত্বরান্বিত (Accelerated) হয়েছে। অন্যদিকে এটা সহজেই বোঝা যায় মহাকর্ষের টানে মহাবিশ্বের বিপুল ভর পরস্পরের কাছে চলে আসবে, অর্থাৎ মহাবিশ্বের প্রসারণ ঘটলেও সেই প্রসারণের হার ক্রমশ মন্দীভূত (Retrated) হওয়ার কথা। কিন্তু অদ্ভুতভাবে হচ্ছে ঠিক তার উল্টো, অর্থাৎ বেগ কমার বদলে আরও প্রবলভাবে বেড়ে যাচ্ছে। সমস্ত গ্যালাক্সিগুলোর ভিতরেই এই উল্টো ক্রিয়া। তার মানে মহাকর্ষের বিপরীতে কোন এক অদৃশ্য বিশাল শক্তি রয়েছে যেটি মহাবিশ্বের বস্তুরাশিদের নিজেদের মহাকর্ষের টানে কাছে আসতে দিচ্ছে না। এই পরম রহস্যময় অজানা শক্তিকেই বলে অদৃশ্য শক্তি বা কৃষ্ণ শক্তি (Dark Energy)।

অদ্ভুত ব্যাপার হল এই শক্তির সঙ্গে কোন নির্দিষ্ট বলের (মহাকর্ষীয় বা তড়িৎচুম্বকীয়) যোগসূত্র নেই। বিজ্ঞানীদের মতে এই শক্তি স্থান-কালের একটি বিশেষ ধর্ম এবং স্থান-কাল প্রসারিত হলে এই শক্তির মোট পরিমাণ ব্রহ্মান্ডের মোট শক্তির প্রায় ৭৩ শতাংশ। আইনস্টাইনের ভর ও শক্তির তুল্যমূল্যতার বিখ্যাত সমীকরণটির ($E = mc^2$) সাহায্যে বলা এই শক্তি প্রায় ৯৬ শতাংশ (যার মধ্যে ২৩ শতাংশ হল অদৃশ্য বস্তু বা কৃষ্ণ বস্তু)। বাকি ৪ শতাংশ আমাদের জানা অর্থাৎ তারা কি দিয়ে তৈরি (অণু, পরমাণু, গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদি)। হিসেবটি দেখলে সত্যি হতবাক হয়ে যেতে হয়, যে আমাদের দৃষ্টি ও অনুভূতির অগোচরে কি বিপুল পরিমাণ রহস্যময় জিনিস রয়েছে। গাণিতিক বিশ্লেষণে শতাংশের মোটামুটি হিসেব না হয় পাওয়া গেল। কিন্তু পরীক্ষা করে ওই শক্তির যে পরিমাণ পাওয়া যায় সেটি খুবই নগণ্য; সেই হিসেবটা কোনক্রমেই আজও মেলানো যায়নি।

Email : drbkdm@gmail.com, M. 9433775743, 8582962072

ভবানীপ্রসাদ সাহু

অন্ধ গুরুভক্তির অস্ত্রে শিশু হত্যা

ছবি : সন্দীপ সাহা

গুরুজি বাবাজি স্বামীজি জাতীয় ব্যক্তিদের প্রতি অন্ধভক্তি আর দ্বিধাহীন নির্ভরতার পরিণাম কি মর্মান্তিক হতে পারে তার একটি উদাহরণ কিছুদিন আগে পাওয়া গেল, এই পশ্চিমবঙ্গে, শান্তিপুরে। পাপ্পু নামে সাড়ে তিনমাস বয়সের এক শিশুর বাড়ির সবাই ছিল সুভাষচাঁদ নামে এক ধর্মীয় গুরুর ভক্ত। বিয়ের পাঁচ বছর পরে এই সন্তান লাভ। তখনি বাড়ির লোকজনের বদ্ধমূল বিশ্বাস জন্মেছিল যে, এই শিশুটি গুরুজির কৃপারই ফল আর তার জন্মমৃত্যু সবই গুরুজির হাতে।

রাত তিনটের সময় পাপ্পুর মা তাকে বুকের দুধ খাইয়েছিল, কিন্তু ভোরবেলা তার ঠাকুমা তাকে কোলে নিতে গিয়ে দেখেন বাচ্চাটির চোখ উল্টে গেছে। না, কোন হাসপাতাল বা ডাক্তারের কাছে নয়, বাচ্চাটিকে ফেলে রাখা হল গুরুজির বিশাল ছবির নীচে। সঙ্গে অবশ্যই গুরুজির কাছে আকুল প্রার্থনা। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। দেড় ঘন্টা ধরে কাঁথায় শুয়ে গুরুজির পায়ের কাছে ছটফট করে গেল শিশুটি। খবর পেয়ে পড়শিরা যখন বলে হাসপাতালে যাওয়ার কথা, তখন বাড়ির লোকের উত্তর ছিল, ''আপনাদের ভাবতে হবে না, গুরুদেব আছেন, তিনিই যা করার করবেন।'' অনেক টালবাহানার পর শেষঅব্দি গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য আলতাব হোসেন শেখ প্রায় জোর করেই শিশুটিকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে গিয়েছিলেন শক্তিনগর হাসপাতালে।

কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। শিশুটির মৃত্যু ঘোষণা করা ছাড়া ডাক্তারদের আর কিছু করার ছিল না। হাসপাতাল থেকে মৃতদেহ নিয়ে এসেও গুরুজির ছবির নীচে রাখা হল। বাচ্চাটির দাদুর তখনো কথা, ''কই, হাসপাতাল আমার নাতিকে বাঁচাতে পারল? একমাত্র গুরুদেবই পারেন ওর শরীরে প্রাণ ফেরাতে।''

না, প্রাণ আর ফেরেনি। প্রতিবেশীরা পুলিশে খবর দিতে পুলিশ মৃতদেহটি নিয়ে যায় ময়নাতদন্তের জন্য। (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৯.০৩.১৮)

এখনো এমন গুরুভক্তির অন্ধ কুসংস্কার আমাদের ঘরের পাশের কিছু লোকজনদের মধ্যে আছে তা অবিশ্বাস্য ঠেকলেও, বাস্তব সত্য। বুকের দুধ খাওয়ানোর সময় যথাসম্ভব শিশুটির শ্বাসনালীতে দুধ চলে গেছিল। হয়ে গেছিল ফুসফুসের তীব্র প্রদাহ (নিউমোনাইটিস)। দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে অক্সিজেন ইত্যাদি দিয়ে, প্রয়োজনে ট্রাকিওস্টমি করে শিশুটিকে বাঁচানো যেত। অন্তত সত্যিকারের চিকিৎসা করার চেষ্টা করা যেত। কিছু গুরুর উপর দ্বিধাহীন অন্ধ নির্ভরতার জন্য শিশুটিকে জবাই করা হল।

অথচ এ ব্যাপারে তো সন্দেহের কোন অবকাশই নেই যে, তথাকথিত ঐসব গুরুজি বাবাজি স্বামীজি আমাদের মত সাধারণ মানুষই। বড়জোর কিছু সুন্দর, উপদেশমূলক, আধ্যাত্মিক কথাবার্তা বিশ্বাসযোগ্যভাবে বলার দক্ষতা এদের রয়েছে। তার জোরেই এরা ভক্ত জুটিয়ে বিনা পরিশ্রমে জীবিকা নির্বাহ করে। এই ধরনের সমস্ত ধর্মব্যবসায়ীদের কারোরই যে কোন ধরনের অলৌকিক ক্ষমতা নেই এটি সুনিশ্চিত, তার সহজ কারণ ঐভাবে কোন অলৌকিক ক্ষমতার কোন অস্তিত্ব নেই। তথাকথিত অলৌকিক ঘটনা বলে কিছু কোনদিন ঘটেওনি, ঘটেও না। যা হয় তা প্রাকৃতিক বাস্তব নিয়মেই। আসলে অনেক সময় তার পেছনের কারণ জানতে না পেরে রহস্যময় ঘটনা বলে মনে হয়। 'রণে বনে জঙ্গলে যেখানেই বিপদে পড়িবে আমাকে স্মরণ করিও' জাতীয় কথাবার্তা বলে এবং তা অন্ধবিশ্বাসী ভক্তদের মনে গেঁথে দিয়ে এরা নিজেদের মাহাত্ম্য, আধিপত্য ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

অথচ সামান্য সাধারণ বুদ্ধি ও যুক্তিবোধ দিয়েই বোঝা যায়, কোন গুরুজির কৃপায় সন্তানলাভ হতে পারে না। দেরিতে সন্তান হওয়ার বা আদৌ না হওয়ার পেছনে বাস্তব শারীরিক কারণই ভূমিকা পালন করে। জন্ম, প্রাণ বা মৃত্যুও কোন গুরুজির ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না। কেউ অস্ত্র দিয়ে বা কোনভাবে কাউকে খুন করলে, সে হয় মৃত্যুর কারণ,—খুনি, অপরাধ। এখানে ফুটফুটে শিশুটির বাবা-মা-ঠাকুমা-ঠাকুর্দাই 'খুনি',—অন্ধ গুরুভক্তির অস্ত্রে অসহায় শিশুটিকে খুন করা হল।

Email : sahoo2331953@gmail.com, M. 9733400443

সংবাদ

১১ অক্টোবর বিজ্ঞান দরবার ও পিপলস্ অ্যাসোসিয়েশন ফর সায়েন্স এন্ড এনভায়রনমেন্ট (PASE) যৌথভাবে কাঁচরাপাড়া উদ্বোধনী গার্লস হাইস্কুলে ২৪ তম বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য স্মৃতি বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসার কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। ১২টি স্কুলের প্রায় ১৫০ ছাত্র-ছাত্রী প্রবন্ধ, ছবি, পোস্টার, বিতর্ক, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, প্রতিযোগিতা ও কুইজে অংশগ্রহণ করেন। সারাদিনের অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের শংসাপত্র পুরস্কার ও ট্রফি প্রদান করা হয়। 'পরিবেশ ও আবর্জনা' নিয়ে আলোকচিত্র সহ আলোচনা করেন কল্লোল রায়। অনুষ্ঠানে শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী ও বিজ্ঞানকর্মীরা বক্তব্য রাখেন।

পরিবেশ বিষয়ে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত রচনা (কেয়া দেব, নবম শ্রেণি, বারুইপাড়া হাই স্কুল, হালিশহর)

প্লাস্টিক দূষণ প্রতিকারের জন্য বিকল্প ভাবনা

কম পরিমাণে প্লাস্টিকের ব্যবহার ঃ আমাদের পরিবেশকে প্লাস্টিক দূষণের হাত থেকে বাঁচাতে হলে আমাদের প্লাস্টিকের ব্যবহার কমিয়ে দিতে হবে। প্রথম আমরা যেসব প্লাস্টিক বাদ দেওয়া যায় সেগুলোকে বাদ দিয়ে দেব, তারপর যেই প্লাস্টিক আমাদের পরিবেশের পক্ষে কম ক্ষতিকর সেগুলোকে রাখব। তাহলে আমরা কিন্তু প্লাস্টিককে একেবারেই বাদ দিতে পারি না। কারণ এই প্লাস্টিক উৎপাদনের সাথে জড়িয়ে আছে অনেক মানুষের জীবিকা। সুতরাং আমরা একেবারে প্লাস্টিক বন্ধ করে দিলে তারা জীবিকাহীন হয়ে পড়বে। তাই আমাদের এমন ভাবে প্লাস্টিক ব্যবহার করতে হবে যাতে পরিবেশের কোনো ক্ষতি না হয়।

পুনর্ব্যবহার ঃ আমাদের একটি প্লাস্টিককে বারবার ব্যবহার করতে হবে। অথবা তার পরিবর্তে কাগজের ঠোঙা, চটের ব্যাগ, কাপড়ের ব্যাগ-এর ব্যবহার বাড়িয়ে দিতে হবে। এর ফলে প্লাস্টিকের ব্যবহার কমবে ও পরিবেশ দূষণ মুক্ত থাকবে। এছাড়া এটা আমাদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে কার্যকরী হবে। যেমন— বাড়িতে ইউজ এন্ড থ্রো পেনের পরিবর্তে কালি-কলম ব্যবহার করতে হবে যাতে ব্যবহারের পর ফেলতে না হয়। তাছাড়া বইয়ে মলাট দেওয়ার সময় **প্লাস্টিক মলাটের পরিবর্তে কাগজের মলাট ব্যবহার করতে হবে।**

প্লাস্টিকের পরিবর্তে জিনিস তৈরি ঃ আমরা রোজ প্লাস্টিক, পলিথিন ইত্যাদির ছেঁড়া টুকরো, প্লাস্টিকের ব্যাগ আলাদা আলাদা করে জমা রেখে ফেরিওয়ালাকে দিয়ে দি। তাহলে দেখা যাবে ওই প্লাস্টিক ব্যাগের সাহায্যে নানান ঘর সাজানোর জিনিস তৈরি করে ঘর সাজাতে পারি। এর ফলে প্লাস্টিকের পরিমাণ কমে যাচ্ছে এবং পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকছে।

ব্যাপক পরিমাণে প্রচার ঃ আমাদের নিজ বাড়ি, বিদ্যালয়, রাস্তা-ঘাট, জলাধার প্রভৃতির চারপাশে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে ব্যাপক পরিমাণে প্রচার চালিয়ে বলতে হবে তারা যেন তাদের বাড়ির আশেপাশে, জলাধারে, নর্দমায় প্লাস্টিক ও অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ না ফেলে যথাস্থানে অর্থাৎ ময়লা ফেলার পাত্রে ফেলে এবং তাদের চারপাশকে পরিষ্কার রাখে এবং পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে মুক্তি দেয়।

পরিষ্কারকরণ ঃ আমাদের ''নির্মল বিদ্যালয় অভিযান'', ''নির্মল বাংলা অভিযান'', ''স্বচ্ছ ভারত অভিযান''-এ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে নিজ বাড়ি, বিদ্যালয়, নর্দমা, জলাশয় প্রভৃতি নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে এবং যারা জায়গাগুলোকে নোংরা করে তাদের সাবধান করতে হবে। এই পদক্ষেপগুলি আমরা গ্রহণ করলে আমাদের পরিবেশ প্লাস্টিক দূষণের হাত থেকে রক্ষা পাবে এবং পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে। এইসব ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা এগিয়ে আসবে এবং শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাদের সাহায্য করবে।

পরিবেশ বিষয়ে অঙ্কণ প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত ছবি (অহনা ঘোষ, অষ্টম শ্রেণি, কাঁচরাপাড়া ইন্ডিয়ান গার্লস হাই স্কুল)

মানস প্রতিম দাস

কে আবিষ্কার করেছিলেন নেপচুন?

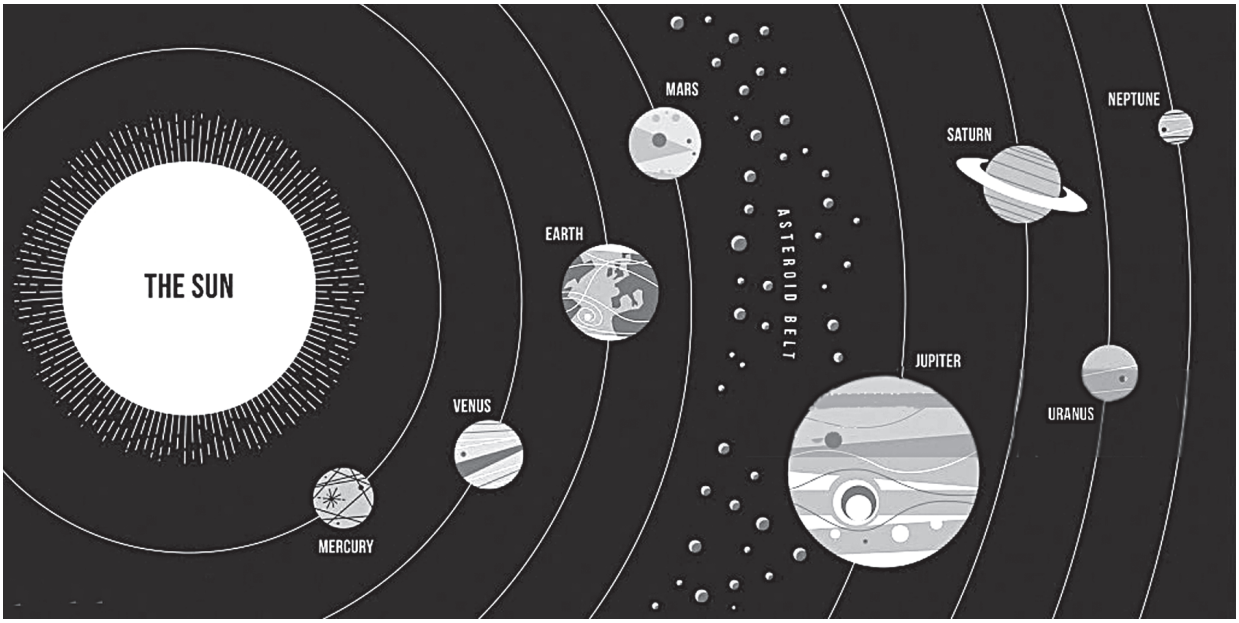

সৌরজগতে সব থেকে দূরের গ্রহ কোন্‌টা? বেশ কিছুদিন আগে অবধি এই প্রশ্নের উত্তরে ছেলে-বুড়ো, শিক্ষক-ছাত্র একযোগে বলত—প্লুটো। তারপরে পতন ঘটল প্লুটোর, বিশ্বের জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ভোটাভুটিতে সে বাদ পড়ল গ্রহের দল থেকে, তার তকমা হল 'বামন গ্রহ'। এখন তাহলে দূরতম গ্রহ হল নেপচুন। সূর্যের পরিবারের আর সাতটা গ্রহের মতই এরও নিশ্চিতভাবে কিছু বিশিষ্টতা আছে। কিন্তু এই নিবন্ধে নজর থাকবে নেপচুনের আবিষ্কারের বিতর্কিত ইতিহাসের উপর। জ্যোতির্বিজ্ঞানের লিখিত ইতিহাস অনুযায়ী নেপচুনের আবিষ্কার হয় ১৮৪৬ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর। দিনটা এমনিতেই বিশিষ্ট। একে জলবিষুব বলে জানি আমরা, দিন ও রাত সমান হয় এই তারিখে, এরপরই শুরু হয়ে যায় সূর্যের দক্ষিণ গোলার্ধ অভিমুখে চলন (আসলে সূর্য চলে না, পৃথিবীর সাড়ে তেইশ ডিগ্রি ঝুঁকে থাকা এবং সূর্যের চারদিকে তার বার্ষিক গতির জন্যই এমনটা হয়)। ধীরে ধীরে ছোট হতে থাকে দিন, বড় হয় রাত্রি। কিন্তু এই সব চেনা প্রাকৃতিক ঘটনার সঙ্গে নেপচুন আবিষ্কারের আলাদা কোনো সম্পর্ক নেই। বলাই যাক ইতিহাসটা।

আসলে অঙ্ক কষার ফলেই আবিষ্কার হয়েছিল নেপচুনের। শুনলে কেমন খট্‌কা লাগে কথাটায়। পর্বত-নদী-উপত্যকার মত গ্রহের আবিষ্কারও তো হবে চোখে দেখে। খালি চোখে যা দেখা যায় না তার জন্য টেলিস্কোপ রয়েছে। বহু দূরের মহাজাগতিক বস্তু দর্শন তো তার সাহায্যেই হওয়ার কথা। সেভাবে দেখলে টেলিস্কোপ ছাড়া নেপচুনের অস্তিত্ব জানা যেত না কোনোভাবেই। কিন্তু আকাশের কোথায় দেখতে হয় তার জন্যও তো একটা নির্দেশিকা দরকার। সেটা এসেছিল অঙ্কের খাতা থেকে। আসলে ইউরেনাস গ্রহ আবিষ্কারের পর থেকে তার উপর নজর রাখার কসরৎ চালাচ্ছিলেন বিজ্ঞানীরা। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম অনুযায়ী যেভাবে চলার কথা ইউরেনাসের তার থেকে বেশ কিছুটা বিচ্যুতি দেখা যাচ্ছিল। কেন এই বিচ্যুতি? জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের এক-একজন এক-এক রকম ব্যাখ্যা দিতে শুরু করলেন। একটা উপযুক্ত ব্যাখ্যা খাড়া করার চেষ্টায় কেউ-কেউ এমনও বললেন যে সূর্য থেকে অত দূরে মহাকর্ষের নিয়ম নীতি ঠিক কাজ করে না। কিন্তু বিচক্ষণ গবেষকরা জানতেন যে এমন একটা বিশ্বজনীন বলকে এমন ইচ্ছেমত সীমিত করে ফেলা যায় না। তাই তাঁরা অন্য ব্যাখ্যা খোঁজা শুরু করলেন। এঁদের মধ্যে দুজন বিজ্ঞানীর কথা বিশেষভাবে বলতে হয় এখানে। একজন ফ্রান্সের আবাঁ জঁ জোসেফ লে ভেরিয়ার আর অন্যজন ব্রিটেনের জন কাউচ অ্যাডামস। দুজনেই বুঝেছিলেন যে নিশ্চিতভাবে ভারী কোনো বস্তু প্রভাব ফেলছে

জোসেফ লে ভেরিয়ার

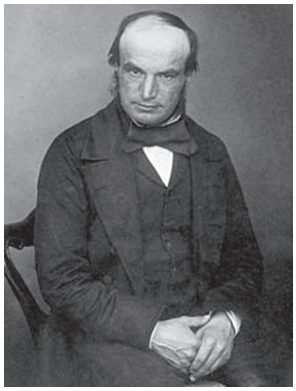

কাউচ অ্যাডামস

ইউরেনাসের গতির উপর। গ্রহ জাতীয় কিছু একটা নিশ্চিতভাবে মহাকর্ষ বল প্রয়োগ করছে ইউরেনাসের উপর। দুজনেই অঙ্ক কষে তেমন একটা বস্তুর অবস্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করতে লাগলেন। পাশাপাশি দূরবীক্ষণ যন্ত্র চোখ রেখেও নিশ্চয়ই কেউ কেউ সেই অনাবিষ্কৃত গ্রহকে খোঁজার চেষ্টা করছিলেন। এ ব্যাপারে সফল হলেন যিনি তাঁর কথাই লেখা রয়েছে ইতিহাসে। তিনি একজন জার্মান, যোহান গটফ্রিড গল।

লে ভেরিয়ারের অনুরোধে তিনি দূরবীক্ষণে চোখ রেখে খুঁজলেন নেপচুনকে। এই পর্যবেক্ষণের জন্য যে নির্দেশিকা দরকার তা এসেছিল ভেরিয়ারের কষা অঙ্ক থেকেই। গল খুঁজে পেলেন নেপচুনকে। ভেরিয়ার যেখানে বলেছিলেন ঠিক সেখানে নয়, তার থেকে এক ডিগ্রি সরে। সে সময়ে অ্যাডামসের অঙ্কটাও নিশ্চয়ই জানা ছিল। দেখা গেল ভেরিয়ারের তুলনায় অ্যাডামসের অঙ্ক ত্রুটিপূর্ণ, তাঁর প্রস্তাবিত জায়গা থেকে প্রায় বারো ডিগ্রি দূরে অবস্থান করছে নেপচুন। সে যাই হোক না কেন, একটা নতুন গ্রহের উপস্থিতির ভবিষ্যদ্বাণী তো দুজনেই করেছেন। তাহলে এবারে কে পাবেন আবিষ্কারকের শিরোপা। ব্রিটেন আর ফ্রান্সের মধ্যে রেষারেষির ইতিহাসও সেই কোন সুদূর অতীতের। এক দেশ অন্য দেশকে কখনই এক ইঞ্চি জমি ছাড়েনি। একটা গোটা গ্রহ আবিষ্কারের ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হবে কেন! অতএব টানাপোড়েন চলেছিল ভালোই। আজ আমরা শান্তিপূর্ণ পথ বেছে নিয়ে বলতে পারি যে ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে ব্রিটিশ-ফরাসি-জার্মান উদ্যোগে আবিষ্কৃত হয়েছিল সৌরজগতের সুদূরতম গ্রহ নেপচুন।

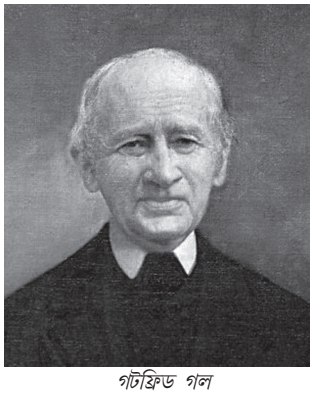

গটফ্রিড গল

তাহলে আবিষ্কারের কাহিনীতে কি ইতি টানা হবে এখানে? ঊনবিংশ শতকের বিজ্ঞানীদের দাবি উড়িয়ে দিয়ে বলা যায় যে নেপচুন আবিষ্কৃত হয়ে গিয়েছিল অনেক আগেই, সপ্তদশ শতকের শুরুর দিকে। কে করেছিলেন আবিষ্কারটা? ইতালিয় বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলেই। ১৬০৯ সাল নাগাদ উদ্ভাবিত হয়েছিল দূরবীক্ষণ অর্থাৎ টেলিস্কোপ। গ্যালিলিওর হাতে সেই যন্ত্র এসেছিল পরের বছরে। এমন একটা জিনিস হাতে পেয়ে গ্যালিলিওর মত মানুষ তো আর বসে থাকতে পারেন না! তিনি দৃশ্যমান আকাশের মানচিত্র তৈরি করতে লেগে পড়লেন। তাঁর সম্পর্কিত লেখায় আমরা বৃহস্পতি গ্রহের চারটে চাঁদ আবিষ্কারের কথা বারবার উল্লিখিত হতে দেখি। আয়ো, ইউরোপা,

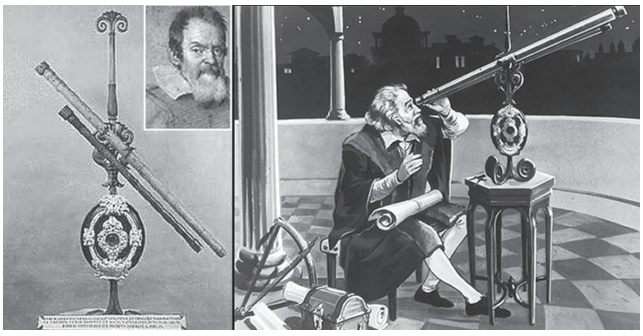

গ্যালিলিও ও তাঁর দূরবীক্ষণ যন্ত্র

ক্যালিস্টো আর গানিমিড। এই চারটে চাঁদ আর বৃহস্পতিকে দেখাতে গিয়ে আশেপাশের আরও অনেক মহাজাগতিক বস্তুর ছবি তিনি এঁকেছিলেন নিজের মানচিত্রে। এরই মধ্যে ছিল নেপচুন। অনেকে বলেন যে গ্যালিলিও নেপচুন দেখেছিলেন ঠিকই তবে অত্যন্ত ধীর গতির কারণে সেটাকে দূরের নক্ষত্র বলে ভুল করেছিলেন। বিজ্ঞান ইতিহাসের আধুনিক গবেষকদের সবাই অবশ্য সেটা মানতে চান না। ইউনিভার্সিটি অফ মেলবোর্নের ডেভিড জেমিসন বলেছেন যে গ্যালিলিও ভালোই বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর দেখা ওই বস্তু, আজকে যাকে নেপচুন বলে চিনি আমরা, তা আসলে এই সৌরজগতেরই একটা গ্রহ। তিনি যে ছবি এঁকেছিলেন তার বিশ্লেষণ করলেই ধরা পড়ে কিছু আশ্চর্য তথ্য!

১৬১২ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে গ্যালিলিও পর্যবেক্ষণ করেন বৃহস্পতির চারটে চাঁদকে। বৃহস্পতি গ্রহেরই দুপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল সেগুলো। এরই সঙ্গে বৃহস্পতির বাঁদিকে, কিছুটা দূরে, একটা মহাজাগতিক বস্তু চিহ্নিত করেন। তাঁর এই পর্যবেক্ষণের দিন ছিল ২৭/২৮ তারিখ। এর পরের যে মানচিত্রটা আমরা পাই তা এক মাস পরে গ্যালিলিও যে পর্যবেক্ষণ করেন তার ফসল। এই মানচিত্রে দেখা যাচ্ছে যে চারটে চাঁদই বৃহস্পতির ডানদিকে চলে গিয়েছে। আর নেপচুনের স্থান বদলেছে ঠিকই তবে সেটা বাঁদিকেই রয়েছে, কেবল নেমে গিয়েছে কিছুটা নীচে অর্থাৎ দক্ষিণদিকে। আজকের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা হিসাব করে বলছেন যে ডিসেম্বর মাসে গ্যালিলিও যখন দেখেছিলেন তখন নেপচুনের গতি ছিল বাঁদিক থেকে ডানদিকে। জানুয়ারি মাসের ৩/৪ তারিখ নাগাদ সেটা বৃহস্পতির পেছনে চলে যায়। জ্যোতির্বিজ্ঞানে এ এক বিরল ঘটনা। সাধারণভাবে এমন একটা বস্তুর পেছনে আর একটার চলে যাওয়াকে বলা হয় অকাল্টেশন। গ্যালিলিও যদি ৪ তারিখের ভোরে তাঁর টেলিস্কোপটি তাক করতেন বৃহস্পতির দিকে তাহলে ঠিক দেখতে পারতেন যে বৃহস্পতির চাঁদের মতই নেপচুন বৃহস্পতির পেছনে চলে গিয়ে ফের বেরিয়ে আসছে। এর পর নেপচুন কিছুটা ডানদিকে গিয়ে আবার ফিরে আসে বৃহস্পতির বাঁদিকে। গ্রহের এমন বিপরীত গতি তো আমাদের অপরিচিত নয়। চলতে চলতে হঠাৎ এমন উল্টোপথে যাত্রা করাকে বক্রী গতি বলা হয়ে থাকে। যাই হোক, এক মাস পরে আবার যখন নেপচুনকে দেখলেন গ্যালিলিও তখন তা আবার এক মাস আগের অবস্থানের কাছাকাছি চলে এসেছে। এতেই সম্ভবতঃ গ্যালিলিওর মনে হয়েছিল যে নেপচুনের গতি অত্যন্ত ধীর। এই ত্রুটি সত্ত্বেও নেপচুন আবিষ্কারের কৃতিত্ব গ্যালিলিওকেই দিতে চান আজকের বিজ্ঞান ইতিহাসকাররা।

এই নিবন্ধ শেষ করার আগে একটা কথা না বললেই নয়। ওই যে আগে ভেরিয়ার, অ্যাডামস আর গলের যৌথ আবিষ্কারের কথা বললাম, এর মধ্যে সম্ভবতঃ সৌভাগ্যের একটা উপাদান রয়ে গিয়েছে। ১৮৪০ থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যে নেপচুনের গতিপথের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ভেরিয়ার আর অ্যাডামস। তাঁরা সৌভাগ্যবান যে এই সময়ে তাঁদের অঙ্কের হিসাব মিলে গিয়েছিল নেপচুনের তখনকার অবস্থানের সঙ্গে। ধরা যাক আরও এক দশক পরে করলে এই সংযোগ ঘটাতে হয়ত পারতেন না তাঁরা। যে অবস্থান তাঁদের অঙ্কে ফুটে উঠত তা হয় ১৬৫ বছর আগেকার আর নয়ত ১৬৫ বছর পরের অবস্থান হত। এর কারণ সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসতে নেপচুনের লাগে ১৬৫ বছর। অবস্থানের ভুল হলে টেলিস্কোপে পর্যবেক্ষণটাও অত সহজ হত না! সে যাই হোক, জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাস এগিয়েছে এভাবেই।

M. 9830312654

বিজয় সরকার

জানো কি?

গভীর সমুদ্রের জল নীল কেন?

আমরা জানি বিশুদ্ধ জল বর্ণহীন, কিন্তু সাগরের জল গাঢ় নীল। ব্যাপারটা ঘটে সূর্য তার সাতটি রঙের আলো নিয়ে সাগরের জলে পড়লে। সূর্যের প্রতিটি রঙের তরঙ্গদৈর্ঘ্য আলাদা-আলাদা। লাল, কমলা, হলুদ এইসব রঙের তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেশি। অন্যদিক নীল রঙের তরঙ্গদৈর্ঘ্য খুবই কম। সূর্যের আলোকরশ্মি যখন সাগরের জলে এসে পড়ে তখন দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো সাগরের জলে ভালোভাবে শোষিত হয়ে যায় কিন্তু কম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের নীল আলো সেভাবে শোষিত না হয়ে প্রতিফলিত হয়। তাই আমরা সমুদ্রের জলের রঙ দেখি নীল।

এখন প্রশ্ন জাগতে পারে, তাহলে নদী, পুকুর বা সমুদ্রের তীরের কাছে জল নীল দেখায় না কেন। এর কারণ হল অগভীর জল বা কাদা, শ্যাওলা প্রভৃতির উপস্থিতিতে এই নীল আলো বিকিরণের ব্যাপারটা ঘটতে পারে না। বালি, কাদা সব ধরনের আলোকেই বিকিরণে বাধা দেয়, ফলে জলের রঙ সবুজ (শ্যাওলার উপস্থিতিতে) বা ধূসর বর্ণ ধারণ করে।

সমুদ্রের জল লবণাক্ত কেন?

সৃষ্টির আদিতে সমুদ্রের জল এত লবণাক্ত ছিল না। সমুদ্রের জলে লবণের অন্যতম যোগানদাতা হল ভূপৃষ্ঠ বা ভূপৃষ্ঠে থাকা নানা ধরনের শিলা। বৃষ্টিপাত যখন হয়, জলের ফোঁটা মাটিতে পড়ার সময় তাতে বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইড জলে দ্রবীভূত হয়ে কিছুটা আম্লিক হয়। এই অম্লধর্মী বৃষ্টির জল ভূপৃষ্ঠের শিলার ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় শিলা কিছুটা ক্ষয়ে গিয়ে তার লবণগুলি জলে দ্রবীভূত হয়। এই দ্রবীভূত লবণ যুগ যুগ ধরে সমুদ্রে গিয়ে জমা হচ্ছে। সূর্যের তাপে সমুদ্রের জল বাস্পীভূত হয়, কিন্তু লবণ সমুদ্রে জমা থেকে যায়। এভাবেই সমুদ্রের জল হয়ে উঠেছে অনেক বেশি লবণাক্ত আর ভূপৃষ্ঠের লবণ গেছে কমে।

Email : bijoysarkar4786@gmail.com, M. 9432335882

জগন্ময় মজুমদার

একদিন স্বপ্নে

আমাদের ঠাকুরঘরে নিজেকে বোতলবন্দি দেখে
আঁতকে উঠলো গঙ্গা।
বলি : এ আর এমন কি
ঘরে ঘরে আছো তুমি ভারতবর্ষের।

কেন কেন—আমাকে শুধালো।

—গঙ্গাজল ছাড়া আমাদের একদম চলে না
পবিত্রতার প্রতীক তুমি।
আচমন থেকে স্নান, জন্ম থেকে মৃত্যু...

—তা বলে আমার বুকে কেন ফেল
আবর্জনা?

আমি চুপ। নিরুত্তর।
সেই থেকে অভিমানে গঙ্গা তার নাব্যতা হারালো।

M. 8961401423

পত্রিকা যোগাযোগ

জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাব M. 9232387401 ● প্রতাপদীঘি লোকবিজ্ঞান সংস্থা M. 9732681106 ● কলকাতা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা M. 9477589456 ● তপন চন্দ, মাদারীহাট, আলিপুরদুয়ার M. 9733153661 ● কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম M. 9434686749 ● গোবরডাঙা গবেষণা পরিষৎ M. 9593866569 ● পরিবেশ বান্ধব মঞ্চ, বারাকপুর M. 9331035550 ● জয়ন্ত ঘোষাল, নৈহাটি M. 8902163072 ● কুনাল দে, ঝাড়গ্রাম M. 9474306252 ● নন্দগোপাল পাত্র, পূর্ব মেদিনীপুর M. 9434341156 ● উৎপল মুখোপাধ্যায়, বারাসাত M. 9830518798 ● ভোলানাথ হালদার, বনগাঁও M. 8637847365 ● শিয়ালদহ ও যাদবপুর স্টেশন, বৈচিত্র্য, পাতিরাম, ধ্যানবিন্দু ও মনীষা (কলেজ স্ট্রিট) ●

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদনগর) পো ঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পো ঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত।
অক্ষর বিন্যাস ঃ রেজ ডট কম, ৪৪/১এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯ ● সম্পাদক ঃ তাপস মজুমদার। ফোন ঃ ৯৮৭৪৭৭৮২১৬/৯৪৭৪৩৩০০৯২
সম্পাদকমণ্ডলী ঃ বিজয় সরকার, প্রবীর বসু, শিবপ্রসাদ সর্দার, সম্রাট সরকার, অনুপ হালদার, সুজয় বিশ্বাস
e-mail : bijnandarbar1980@gmail.com / ganabijnan@yahoo.co.in, Whatsapp No. 8240665747, website : www.ssu2011.com/bigyan-anneswak